Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

বালা মসিবতে ধৈর্য ধারণ ও এর সুফল

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

Hafsa akter

রোলঃ 216021994227

৩০ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

বালা মসিবতে ধৈর্য ধারণ ও এর সুফল

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

Hafsa akter

রোলঃ 216021994227

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ বালা মসিবতে ধৈর্য ধারণ ও এর সুফল ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে Hafsa akter, আইডিঃ 216021994227 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: শারাফাত কারীম
এরাবিক ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " বালা মসিবতে ধৈর্য ধারণ ও এর সুফল " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

-

(স্বাক্ষর)

Hafsa akter

আইডিঃ 216021994227

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

সূচিপত্র

ভূমিকা 5

ধৈর্য কি 7

ধৈর্যের প্রকারভেদ 7

ধৈর্যের ফজিলত 12

পারিবারিক জীবনে ধৈর্যের সুফল 14

আল কোরআনের দৃষ্টিতে বালা মসিবতে ধৈর্যের গুরুত্ব ও তাৎপর্য 15

সবর শব্দের অর্থ ও বিশ্লেষণ 17

বালা মসিবতে হাদিসের আলোকে ধৈর্যের গুরুত্ব 21

সাহাবী ও নবীদের জীবনে ধৈর্যের তাৎপর্য 22

কৃতজ্ঞ ধনীর তুলনায় ধৈর্য্যশীল দরিদ্র উত্তম 25

কাফের ও মুশরিকদের নৃশংসতার উপর ধৈর্যধারণের হুকুম 26

যেভাবে ধৈর্যের চর্চা করব 30

ধৈর্য ঈমানের অংশ 32

ধৈর্য বাড়ানোর উপায় 38

বালা মসিবতে ধৈর্য ধারণের সুফল 40

উপসংহার 42

ভূমিকা

বালা মুসিবত মানব জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আল্লাহ যাকে বেশি ভালোবাসেন তাকেই মসিবত দিয়ে পরীক্ষা করেন।তাই মানুষের উচিত বিপদে হতাশ না হয়ে ধৈর্য ধারণ করা। মানুষের জীবনে যেমন ভালো সময় আসে, অনেক খারাপ সময়ও আসে। অনেক আশাভঙ্গ ও অপ্রাপ্তির মধ্য দিয়ে মানুষের জীবন এগিয়ে যায়। ইসলামের শিক্ষা হলো, ভালো ও খারাপ সব অবস্থায় আল্লাহর ওপর ভরসা করা ও ধৈর্য ধারণ করা। আল্লাহ বলেছেন, তিনি তার বান্দাদের ভয়, ক্ষুধা, জীবন ও সম্পদের ক্ষতির মাধ্যমে পরীক্ষা করবেন। এদের মধ্যে ধৈর্যশীলরা সফল। আল্লাহ বলেন, আর আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব কিছু ভয়, ক্ষুধা, জীবন-সম্পদ ও ফল-ফলাদির স্বল্পতার মাধ্যমে। আর তুমি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও। (সুরা বাকারা: ১৫৫) আরেক আয়াতে যে কোনো বিপদ-আপদে ধৈর্য ও নামাজের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন, হে মুমিনগণ, ধৈর্য ও নামাজের মাধ্যমে সাহায্য চাও। নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন। (সুরা বাকারা: ১৫৩)

বিপদে ধৈর্য ধারণের ফজিলত বর্ণনা করে আল্লাহ রাসুল (সা.) বলেন, কোন মুসলমান যখন বিপদে পড়ে, তখন সে যদি আল্লাহর নির্দেশানুযায়ী ‘ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন’ বলে এবং বলে, ‘হে আল্লাহ! আমাকে বিপদে ধৈর্য ধারণের সাওয়াব দান করুন এবং এর চেয়ে উত্তম বদলা দিন’ তবে আল্লাহ তাকে উত্তম বদলা দিয়ে ধন্য করবেন। (সহিহ মুসলিম) আরেকটি হাদিসে মুমিনের জন্য সুখ-সাচ্ছন্দ্য ও বিপদ-মসিবত উভয়ই কল্যাণকর উল্লেখ করে আল্লাহর রাসুল (সা.) বলেন, ঈমানদারের ব্যাপারটা আশ্চর্যের; ঈমানদারের সব অবস্থাই কল্যাণকর আর এটা শুধু মুমিনদেরই বৈশিষ্ট্য। সুখ-সাচ্ছন্দ্যের সময় মুমিন শোকর করে, এটা তার জন্য কল্যাণকর। কোনো বিপদ এলে মুমিন ধৈর্য ধরে, এটাও তার জন্য কল্যাণকর। (সহিহ মুসলিম)এই ৪টি কাজ বিপদে ধৈর্য ধরতে সহায়ক ১. ইন্নালিল্লাহ পাঠ করা

যে কোনো বিপদ-আপদে ‘ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন’ পড়ুন এবং এর বক্তব্য মনে প্রাণে বিশ্বাস করুন যে আমরা আল্লাহর বান্দা এবং তার কাছেই ফিরে যাবো। তাই আমাদের কর্তব্য তার সব সিদ্ধান্ত মাথা পেতে নেওয়া। দুনিয়ার জীবনের সব বিপদ-মসিবতের প্রতিদান তিনি এ জীবনে বা পরকালে অবশ্যই দেবেন। আল্লাহ বলেন, ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও; যারা কোনো বিপদে পড়লে বলে ওঠে ‘ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন’ অর্থাৎ আমরা সবাই আল্লাহরই এবং আমাদেরকে তার কাছেই ফিরে যেতে হবে। (সুরা বাকারা: ১৫৫-১৫৬)

২. তকদিরের ওপর ঈমান দৃঢ় করা

দুনিয়ার সব কিছুই আল্লাহর নির্ধারণ অনুযায়ী হয়। তিনি সৃষ্টি করার সময়ই সব কিছুর ভাগ্যও নির্ধারণ করে দিয়েছেন। ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত রাসুল (সা.) বলেন, যদি সবাই তোমার কোনো উপকারের উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধ হয়, তাহলে ততটুকু উপকার করতে পারবে, যতটুকু আল্লাহ তাআলা তোমার জন্য লিখে রেখেছেন। অন্যদিকে সবাই যদি তোমার কোনো ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে একতাবদ্ধ হয়, তাহলে ততটুকু ক্ষতি করতে সক্ষম হবে, যতটুকু আল্লাহ তাআলা তকদিরে লিখে রেখেছেন। কলম তুলে নেওয়া হয়েছে এবং লিখিত কাগজও শুকিয়ে গেছে। (সুনানে তিরমিজি)

৩. বিপদ অনেক সময় আশীর্বাদ হয়ে আসে

আমাদের জীবনে এমন অনেক ঘটনা ঘটে, যা আপাতদৃষ্টিতে মসিবত মনে হলেও আল্লাহ তাতে অনেক কল্যাণ রেখে দেন। ছোট বিপদ অনেক সময় বড় বিপদ ঠেকিয়ে দেয়। আল্লাহ চাইলে আরও কত খারাপ কিছু হতে পারতো, তা চিন্তা করে এটা ভাবুন যে, হতে পারে এই ছোট বিপদটি দিয়ে আল্লাহ আপনার জীবন থেকে অনেক বড় কোনো বিপদ দূর করে দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, হতে পারে কোন বিষয় তোমরা অপছন্দ করছ অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর হতে পারে কোন বিষয় তোমরা পছন্দ করছ অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জান না। (সুরা বাকারা: ২১৬)

৪. দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী নিবাস

এ কথা চিন্তা করুন যে দুনিয়ার জীবন একেবারেই ক্ষণস্থায়ী। এ জীবনের লাভ বা ক্ষতিও ক্ষণস্থায়ী। দুনিয়ার বিপদ-মসিবতে ধৈর্য ধারণ করতে পারলে পরকালে আল্লাহর কাছে এর প্রতিদান পাওয়া যাবে এবং তা নিশ্চই দুনিয়ার সুখ-সমৃদ্ধির চেয়ে অনেক উত্তম হবে। আল্লাহ বলেন, সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দুনিয়ার জীবনের শোভা। আর স্থায়ী সৎকাজ তোমার রবের নিকট প্রতিদানে উত্তম এবং প্রত্যাশাতেও উত্তম। (সুরা ফুরকান: (৪২)

(https://www.jagonews24.com/religion/islam/975073)

ধৈর্য কি

ধৈর্য এর আরবি প্রতিশব্দ সবর।এর আভিধানিক অর্থ হলো আনন্দ, প্রতিকূলতা, দুঃখ এবং উদ্বেগ ইত্যাদির সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং মন্দ কাজগুলি এড়ানো। সহ্য বা অপেক্ষা করবার ক্ষমতা, সহিষ্ণুতা, ধীরতা।

আনন্দ, ঝামেলা, দুঃখ ও উদ্বেগ ইত্যাদী সময়ে নিজেকে নিজে নিয়ন্ত্রণে রেখে আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক নির্ধারিত সীমাবদ্ধতার মধ্যে থাকা। প্রকৃত ধৈর্য বলা হয় -যা কোন অভিঘাত, দুঃখ, দুর্দশার শুরু থেকেই গ্রহণ করা হয়।

নবী করীম (সা.) বলেন- إِنَّمَا الصَّبْر عِندَ الصّدمة الأولىٰ

অনুবাদ: নিশ্চয় ধৈর্য যা আঘাতের প্রারম্ভেই নেওয়া হয়।(- বুখারী, হাদীস নং ১৩০২) ধৈর্য একটি মহৎ গুণ। যার ধৈর্য যত বেশি সে জীবনে তত বেশি সফল।

ধৈর্যের প্রকারভেদ

আমাদের আলেম-ওলামারা বলেছেন— ধৈর্য তিন প্রকার।

প্রথম প্রকার ধৈর্য হলো, বিপদে পড়লে ধৈর্য ধারণ করা। এই প্রকারের ধৈর্য সবচেয়ে নিম্নস্তরের। কারণ, এটা আপনার নিয়ন্ত্রণের বাহিরে। আপনার পক্ষে নিজের পরিস্থিতির উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয় না। যেমন— চাকরি হারানো, প্রিয় কারো মৃত্যু ইত্যাদি।

এখন, এসব ক্ষেত্রে কিভাবে ধৈর্য প্রদর্শন করতে হবে? আপনাকে জিহ্বা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার প্রতি আশাবাদী মনোভাব পোষণ করতে হবে। এ বিপদটা কেন আপনার উপর এসে পড়লো আপনাকে এটা না বুঝলেও চলবে। আপনি দুঃখ অনুভব করতে পারবেন। দুঃখ অনুভব করা মানব প্রকৃতির অংশ। কাঁদতে পারবেন। শোকাহত হতে পারবেন। কিন্তু, কোনোভাবেই আল্লাহর বিজ্ঞতা, দয়া এবং ভালোবাসা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারবেন না। অন্তরেই এসব প্রশ্নকে পাত্তা দেয়া যাবে না, মুখে উচ্চারণ তো দূরে থাক।

অতএব, এসব ক্ষেত্রে ধৈর্য মানে বিপদে পড়লে আপনার চিন্তাকেও নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। বিশেষ করে আপনার জিহ্বা। আপনি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার বিজ্ঞতাকে প্রশ্ন করতে পারবেন না। আর এ ধরণের ধৈর্য হলো সবচেয়ে নিম্নস্তরের ধৈর্য।

দ্বিতীয় প্রকারের ধৈর্য হলো— পাপ করা থেকে এবং আল্লাহর অবাধ্য হওয়া থেকে ধৈর্য ধারণ করা ও নিজেকে বিরত রাখা। এই প্রকারের ধৈর্য কখনো কখনো তুলনামূলকভাবে বেশি কঠিন। কারণ, প্রচুর পাপ করার সুযোগ আমাদের সামনে সবসময় উন্মুক্ত।

এ ক্ষেত্রে ধৈর্য ধারণ করার মানে হলো— নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা, আটকিয়ে দেওয়া, নিজের লালসায় লাগাম পরানো। আমাদের নিজেদের সংযত করা, টেনে ধরা, দমন করা। লোভনীয় কিছু সামনে আসলেই আমরা ঝাঁপিয়ে পড়ি না। এই প্রকারের ধৈর্য ধারণ করার ক্ষেত্রে দক্ষ হওয়ার জন্য রামাদান মাস আমাদের সাহায্য করে। (নফল রোজাও এ ক্ষেত্রে সাহায্য করে।)

চিন্তা করে দেখুন। রামাদানে আমরা নিজেদের খাদ্য এবং পানি পান থেকে বিরত রাখি। যৌন চাহিদা পূরণ থেকেও আমরা নিজেদের বিরত রাখি। সুতরাং, আমরা তখন শিখি কিভাবে আমাদের জন্য হালাল নয় এমন জিনিস থেকেও নিজেদের বিরত রাখবো। আমরা তখন খাওয়া এবং পান করা থেকে বিরত থাকি একমাত্র এই কারণে যে আল্লাহ বলেছেন খাওয়া এবং পান করা থেকে বিরত থাকো। তাই, আমরা খাই না এবং পান করি না।

তাহলে, মন্দ কাজের ব্যাপারে কী করবেন? আল্লাহ যখন বলেন মদ পান করো না, সব ধরণের মাদক থেকে দূরে থাকো, চুরি করো না, ব্যভিচার করো না ইত্যাদি। এভাবে আমরা যখন বৈধ কাজ খাওয়া এবং পান করা থেকে বিরত থাকার ক্ষেত্রে দক্ষ হয়ে উঠি, আমাদের জন্য তখন হারাম কাজ থেকে বিরত থাকার ক্ষেত্রে দক্ষ হয়ে উঠা সহজ হয়ে যায়।

তৃতীয় প্রকারের ধৈর্য, যা সর্বোচ্চ লেভেলের, এ ধরণের ধৈর্য অবলম্বন করা সত্যিই কঠিন। এর পরিবর্তনশীল অবস্থার কারণে, এ ধরণের সবরের কথা আমাদের মাথায়ও না আসার কারণে।আর তা হলো— সময় নষ্ট করা থেকে নিজেকে বিরত রাখা। উপকারী কিছুতে নিজেকে ব্যস্ত রাখা এবং আল্লাহর ইবাদাতে নিজেকে আটকিয়ে রাখা। সবসময় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার ইবাদাতে মগ্ন থাকা। এই প্রকারের ধৈর্য ধরার মানে— নিজেকে আটকিয়ে দেওয়া, বাধা দেওয়া, সংযত করা এমনকি হয়তো হালাল কিছু থেকেও। (কাজটিতে হয়তো গুনাহ নেই, কিন্তু কোনো সওয়াবও হবে না।)

এ ধরণের কাজে বেশি জড়িয়ে পড়লে তা মাকরূহে পরিণত হয়। অতিরিক্ত বেহুদা কাজে, সময় নষ্ট হওয়ার কাজে যুক্ত হওয়া থেকে নিজেকে বিরত রাখা। এবং নিজের জন্য বেশি উপকারী কাজে যুক্ত থাকা। বেশি বেশি কুরআন অধ্যয়ন করা, মুখস্ত করা, নামাজে সেগুলো তিলাওয়াত করা, অতিরিক্ত জিকির করা, অতিরিক্ত দান করা।

আল্লাহ তাঁর ক্ষমা, জান্নাত এবং জান্নাতের উচ্চ মর্যাদা পাওয়াকে ধৈর্য ধারণ করার সাথে যুক্ত করেছেন। আমি আবারো বলছি, আল্লাহ তাঁর ক্ষমাকে ধৈর্যের সাথে যুক্ত করেছেন। আল্লাহ

কুরআনে বলেন- اِلَّا الَّذِيۡنَ صَبَرُوۡا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ؕ اُولٰٓئِکَ لَهُمۡ مَّغۡفِرَةٌ وَّ اَجۡرٌ کَبِیۡرٌ - "তবে যারা সবর করেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তাদের জন্যই রয়েছে ক্ষমা ও মহা প্রতিদান।" (১১:১১) তাহলে আল্লাহর ক্ষমা ধৈর্যের সাথে সম্বন্ধযুক্ত।

জান্নাতে প্রবেশ এবং জান্নাতে উচ্চ মর্যাদা পাওয়াকেও ধৈর্য ধারণের সাথে সম্পর্কযুক্ত করা হয়েছে। আল্লাহ কুরআনে বলেন, جَنّٰتُ عَدۡنٍ یَّدۡخُلُوۡنَهَا وَ مَنۡ صَلَحَ مِنۡ اٰبَآئِهِمۡ وَ اَزۡوَاجِهِمۡ وَ ذُرِّیّٰتِهِمۡ وَ الۡمَلٰٓئِکَةُ یَدۡخُلُوۡنَ عَلَیۡهِمۡ مِّنۡ کُلِّ بَابٍ ﴿۲۳﴾ - "স্থায়ী জান্নাতসমূহ, যাতে তারা এবং তাদের পিতৃপুরুষগণ, তাদের স্ত্রীগণ ও তাদের সন্তানদের মধ্যে যারা সৎ ছিল তারা প্রবেশ করবে। আর ফেরেশতারা প্রতিটি দরজা দিয়ে তাদের নিকট প্রবেশ করবে।" سَلٰمٌ عَلَیۡکُمۡ بِمَا صَبَرۡتُمۡ فَنِعۡمَ عُقۡبَی الدَّارِ - (আর বলবে) "তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক, কারণ তোমরা ধৈর্যধারণ করেছিলে। আখিরাতের এ পরিণাম কতই না উত্তম"। (১৩:২৩-২৪)

কল্পনা করুন, আপনি জান্নাতে আছেন। জান্নাতের আসন সমূহে হেলান দিয়ে শুয়ে জান্নাতের সৌন্দর্য উপভোগ করছেন। আর ফেরেশতারা দলে দলে এসে আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন। তখন তাঁরা কী বলে অভিনন্দন জানাচ্ছেন? "সালামুন আলাইকুম বিমা সবারতুম- তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক, কারণ তোমরা ধৈর্যধারণ করেছিলে।"

তাহলে দেখা যাচ্ছে, ফেরেশতারা জান্নাতে আপনার অবস্থান এবং মর্যাদাকে এই দুনিয়ায় আপনি যে ধৈর্য দেখিয়েছেন তার সাথে যুক্ত করেছেন।
আর জান্নাতের যে কোনো জায়গা নয়, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা সর্বোচ্চ ধাপের জান্নাতের কথা ধৈর্য ধারণের সাথে যুক্ত করেছেন। আল্লাহ বলেন- اُولٰٓئِکَ یُجۡزَوۡنَ الۡغُرۡفَةَ بِمَا صَبَرُوۡا - "এদেরকেই তাদের ধৈর্যধারণের কারণে জান্নাতের সুউচ্চ স্থান দান করে পুরস্কৃত করা হবে।" (২৫:৭৫)

তাহলে ধৈর্য আপনাকে জান্নাতের সুউচ্চ লেভেল পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিবে।
এমনকি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা স্বয়ং আপনাকে অভিনন্দন জানাবেন আপনি যে ধৈর্য প্রদর্শন করেছেন তার জন্য। আক্ষরিক অর্থেই কুরআনে এসেছে- اِنِّیۡ جَزَیۡتُهُمُ الۡیَوۡمَ بِمَا صَبَرُوۡۤا ۙ اَنَّهُمۡ هُمُ الۡفَآئِزُوۡنَ - "আজ আমি তাদেরকে পুরস্কৃত করলাম তাদের ধৈর্য ধারণের কারণে, আজ তারাই তো সফলকাম।" (২৩:১১১)
এখানে আল্লাহ ফাস্ট পার্সনে কথা বলছেন। তিনি সাধারণত এভাবে কুরআনে কথা বলেন না। আল্লাহ সাধারণত থার্ড পার্সনে কথা বলেন। "আমরা করব বা তাদের প্রতি আশীর্বাদ করা হবে..." কিন্তু এই আয়াতে তিনি ফাস্ট পার্সনে কথা বলছেন। তিনি আমাদের সরাসরি সম্বোধন

করে বলছেন- "ইন্নি জাজাইতুহুমুল ইয়াওমা বিমা সবারু- নিশ্চয় আমি তাদের ধৈর্যের কারণে আজ তাদেরকে পুরস্কৃত করলাম।"

তাহলে আল্লাহ নিজে ধৈর্যশীলদের পুরস্কৃত করবেন। তারপর আল্লাহ বলেন, আন্নাহুম হুমুল ফা-ইজুন- এরাই হলো তারা যারা জিতে গেছে।
কুরআনে জান্নাত জিতার একটা রূপক ব্যবহার করা হয়েছে। প্রতিযোগিতায় জয় লাভ করার একটা রূপক ব্যবহার করা হয়েছে। কারা সত্যিকারের জয় লাভ করেছে? আল্লাহ বলেন- আন্নাহুম হুমুল ফা-ইজুন- এরাই হলো তারা যারা জিতে গেছে।
বালা মসিবতে ধৈর্যের উপকারিতা
মানবজীবনে ধৈর্যের উপকারিতা অনেক।ধৈর্য ছাড়া মানবজীবনে সফলতা অর্জন করা যায় না।ধৈর্য মানব জীবনের মহৎ গুণ, এটা সফলতার চাবিকাঠি। ধৈর্যের অনুশীলন ছাড়া ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনে সাফল্য অর্জন করা অসম্ভব। আনন্দ, ঝামেলা, দুঃখ ও উদ্বেগ ইত্যাদির সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রেখে আল্লাহ ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক নির্ধারিত সীমাবদ্ধতার মাঝে থাকাই হলো ধৈর্য। এ প্রসঙ্গে কোরআনে কারিমে ইরশাদ হয়েছে, ‘হে ইমানদাররা! ধৈর্য ধারণ করো এবং মোকাবিলায় দৃঢ়তা অবলম্বন করো। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাকো, যাতে তোমরা তোমাদের উদ্দেশ্য লাভে সমর্থ হতে পারো।’ সুরা আলে ইমরান : ২০০
বাস্তবতা হলো, মুখে বলা সহজ হলেও ধৈর্য ধারণ খুব কঠিন কাজ। তবুও সমাজের জন্য, মানুষের কল্যাণের জন্য তা করা আবশ্যক। সমাজ জীবনে শান্তি, শৃঙ্খলা ও কল্যাণময় জীবনযাপনের জন্য ধৈর্যের গুরুত্ব অপরিসীম। মহান আল্লাহ বলেন, ‘হে আমার বিশ্বাসী বান্দারা! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় করো। যারা এ দুনিয়ায় সৎকাজ করে, তাদের জন্য রয়েছে পুণ্য। আল্লাহর পৃথিবী প্রশস্ত। যারা সরকারি, তারাই তাদের পুরস্কার পায় অগণিত।’ সুরা আয যুমার : ১০
মানুষের জীবনে সুখ-দুঃখ, বিপদ-আপদ, সফলতা-বিফলতা, ভয়-পরাজয় আসবেই। তবে এমন দুঃখ, বিপদ আর বিফলতায় পড়ে দুনিয়ার মায়ায় আটকে থাকা যাবে না। মনে রাখতে হবে, আল্লাহ তার প্রিয় বান্দাদের বেশি পরীক্ষা নেন। আর সেই বান্দা সফল হবে, যে এমতাবস্থায় ধৈর্য ধারণ করেন।
একজন মুমিনকে অবশ্যই সুদিনের জন্য ধৈর্য ধারণ করতে হবে। তেমনি সুখশান্তি প্রাপ্তিতেও আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করতে হবে। ধৈর্যের মাহাত্ম্য, গুরুত্ব এবং দুনিয়া ও আখেরাতের উপকারিতাগুলো দেখলে তা ভালোভাবে বোঝা যায়। পবিত্র কোরআনে বহুবার, নানা প্রসঙ্গে জীবনের বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ধৈর্য ধারণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
হজরত ইবরাহিম (আ.) যখন নমরুদের মূর্তিপূজার বিরোধিতা করল, তখন নমরুদ তাকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত করেছিল, কিন্তু তিনি ছিলেন ধৈর্যশীল। তিনি একমাত্র তার রবের সাহায্য

ছাড়া অন্য কারও কাছে সাহায্যে চাননি। হজরত ইউসুফ (আ.) যখন জুলেখার ষড়যন্ত্রে আটকে গেলেন, তখনো তিনি একমাত্র রবের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন।

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আল্লাহর একত্ববাদ প্রচারে অটল, মক্কার কাফের-মুশরিকরা তখন দেখল যে প্রলোভন, ভীতি ও অকথ্য নির্যাতন তথা কোনো কিছুর মাধ্যমেই তাকে দমন করা যাচ্ছে না, বরং ইসলামের অনুসারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ অবস্থায় তারা ক্ষুব্ধ হয়ে হজরত মুহাম্মদ (সা.)-কে সামাজিকভাবে বয়কটের সিদ্ধান্ত নেন। অতঃপর তারা নবী করিম (সা.) ও তার অনুসারীদের সঙ্গে ওঠা-বসা, বেচাকেনা, লেনদেন এমনকি খাদ্য ও পানি সরবরাহ বন্ধ করে অবরোধ আরোপ করে। এমন দুর্দিনেও রাসুল (সা.) ধৈর্য হারাননি, বরং তিনি আল্লাহর ওপর ভরসা করে সব সহ্য করেছেন।

শরিয়তের বিধান পালন করতেও ধৈর্যের প্রয়োজন। দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায়, রমজান মাসের রোজা পালন, প্রচুর অর্থ ব্যয় করে হজ পালন, সম্পদ অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে জাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে ধৈর্য ধারণ করতে হয়।

প্রসঙ্গক্রমে ধৈর্যশক্তি বাড়ানোর উপায় নিয়ে আলোচনা দরকার। ধৈর্য বাড়ানোর উপায়গুলোর অন্যতম হলো সব সময় অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটে যাওয়ার জন্য নিজেকে প্রস্তুত রাখা। যেকোনো বিষয় মানুষের ভাবনা ও পরিকল্পনা অনুযায়ী নাও এগোতে পারে। ইসলাম মনে করে, প্রত্যাশা হতে হবে বাস্তবভিত্তিক। ধৈর্য ও সাফল্য একটির সঙ্গে আরেকটি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। মূলত মানুষ অতীত নিয়ে দুঃখিত, ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্ন এবং বর্তমান নিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকে।

ধৈর্য আল্লাহর পরিপূর্ণ মুমিন বান্দাদের বৈশিষ্ট্য। মহান আল্লাহ যাকে এই গুণ দেন, সে এই গুণে গুণান্বিত হয়। আল্লাহতায়ালা নবী-রাসুলকে এই বিরল গুণে বিভূষিত করেছিলেন। পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের বিভিন্ন স্তরে ধৈর্যধারণের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মানুষের কর্তব্য হলো, সব ধরনের বিপদাপদে ধৈর্যধারণ করা, বিপদমুক্তির জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করা, ধৈর্যশীল হওয়া।

ধৈর্যের কারণে মানুষ অসুন্দর ও খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকতে পারে। এটি মানুষের একটি অভ্যন্তরীণ শক্তিবিশেষ, যা দিয়ে সে নিজেকে সুস্থ ও সুরক্ষিত রাখতে পারে। ধৈর্যের প্রতিদান কিংবা ফলাফল দুনিয়াতেও পাওয়া যায়, আখেরাতেও পাওয়া যাবে। ধৈর্যের উপকারিতা অনেক। ইরশাদ হয়েছে, ‘আল্লাহ ও তার রাসুলের আনুগত্য করবে এবং পরস্পরে কলহ করবে না, অন্যথায় তোমরা দুর্বল হয়ে পড়বে এবং তোমাদের হাওয়া (প্রভাব) বিলুপ্ত হবে। আর ধৈর্য ধারণ করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন।’

(তথ্য
https://www.deshrupantor.com/364649/%E0%A6%A7%E0%A7%88%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%97%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AC-%E0%A6%85%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%B8%E0%A7%80%E0%A6%)

ধৈর্যের ফজিলত

সবর বা ধৈর্যের গুরুত্বের কথা ইসলাম ধর্মে বারবার বলা হয়েছে। তাফসিরে বায়জাবি অনুসারে ধৈর্য তিন প্রকার: ১. 'সবর আনিল মাসিয়াত', অর্থাৎ অন্যায়-অপরাধ থেকে বিরত থাকা। ২. 'সবর আলাত তআত', অর্থাৎ ইবাদতে আল্লাহর আনুগত্য ও সৎ কর্মে কষ্ট স্বীকার করা। ৩. 'সবর আলাল মুসিবাত', অর্থাৎ বিপদে অধীর না হওয়া।

কোনো লোক যদি ওপরের পথ ধরে ধৈর্য অবলম্বন করে, তবে তার জীবনে পূর্ণতা ও সফলতা আসবে। এই সবরে বা ধৈর্যে কিছু মূল্যবান উপাদান আছে। প্রথমত, অন্যায়-অপরাধ ও পাপকাজ থেকে বিরত থাকা। সব রকমের অকল্যাণ ও গ্লানি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এটি অন্যতম উপায়। দ্বিতীয়ত, ইবাদত ও সৎ কাজ করা। ইবাদত ও সৎ কাজ পবিত্রতা এনে দেয়। তৃতীয়ত, প্রতিকূলতার সময় ধৈর্য ধরে থাকা। সবরে কামিল বা পরিপূর্ণ ধৈর্যই মানবজীবনকে পূর্ণতা দিতে পারে।

যেকোনো অযাচিত পরিবেশে ও অনাহূত পরিস্থিতিতে নিজেকে সংযত রেখে দৃঢ়তার সঙ্গে এগিয়ে যাওয়ার উদাহরণ আছে যেমন হজরত মুসা (আ.)-এর জীবনীতে। তিনি নদীর পারে এসে নদী পারাপারের উপায় না দেখে প্রবল বিপদের মুখোমুখি হয়েও ধৈর্য হারাননি। বরং উম্মতকে সান্ত্বনা দিয়ে দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে দৃপ্ত কণ্ঠে বলেছিলেন, 'কালা কাল্লা! ইন্না মায়িয়া রব্বি ছাইয়াহদিন।' অর্থাৎ, 'কিছুতেই না। আমার সঙ্গে আছেন আমার প্রতিপালক; তিনি আমাদের পথ দেখাবেন।' (সুরা শোআরা, আয়াত: ৬২)

হজরত মুহাম্মদ (সা.) মক্কা থেকে হিজরত করে মদিনায় যাওয়ার পথে সাওর পর্বতের গুহায় আত্মগোপন করে থাকার সময় তাঁর সঙ্গী হজরত আবুবকর সিদ্দিক (রা.)-কে এভাবেই আশ্বস্ত করেছিলেন। কোরআন শরিফে তার উল্লেখ করে বলা হয়েছে, 'যদি তোমরা তাকে (রাসুলকে) সাহায্য না কর, (তবে স্মরণ করো) আল্লাহ তাকে সাহায্য করেছিলেন, যখন অবিশ্বাসীরা তাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। সে ছিল দুজনের একজন। অপরজন আবু বকর (রা.), যখন তারা গুহার মধ্যে ছিল; সে তখন তার সঙ্গীকে বলেছিল, মন খারাপ কোরো না, আল্লাহ তো আমাদের সঙ্গে আছেন। তারপর আল্লাহ তার ওপর তাঁর প্রশান্তি বর্ষণ করলেন। আর এমন এক সৈন্যবাহিনী দিয়ে তিনি তাকে শক্তিশালী করলেন, যা তোমরা দেখনি আর তিনি অবিশ্বাসীদের কথা তুচ্ছ করলেন। আল্লাহর কথাই সবার ওপরে। আর আল্লাহ তো শক্তিমান তত্ত্বজ্ঞানী।' (সুরা তওবা, আয়াত: ৪০)

হজরত আনাস ইবনে মালিক (রা.)-র কাছ থেকে একটি হাদিস জানা যায়। হজরত আবু তালহা (রা.)-এর এক ছেলে একবার অসুস্থ হয়ে পড়ল। আবু তালহা (রা.) বাইরে গেলেন। সে সময় ছেলেটি মারা যায়। তিনি ফিরে এসে জানতে চাইলেন, ছেলেটি কী করছে?

তাঁর স্ত্রী হজরত উম্মে সুলায়ম (রা.) বললেন, সে আগের চাইতে শান্ত। এর পর তাঁকে রাতের খাবার দিলেন। তিনি খাদ্য গ্রহণের পর উম্মে সুলায়মের সঙ্গ নিলেন। এর পর উম্মে সুলায়ম বললেন, ছেলেকে দাফন করে এসো।

সকাল হলে আবু তালহা (রা.) রাসুলুল্লাহ (সা.)–এর কাছে এসে ঘটনাটি বললেন। রাসুল (সা.) জিজ্ঞেস করলেন, গত রাতে তুমি কি স্ত্রীর সঙ্গে ছিলে?

তিনি বললেন, হ্যাঁ!

নবী (সা.) বললেন, 'ইয়া আল্লাহ! তাদের জন্য তুমি বরকত দান করো।'

এরপর উম্মে সুলায়ম (রা.) একটি সন্তান প্রসব করলেন।

আবু তালহা (রা.) সেই শিশুটিকে নিয়ে নবী করিম (সা.)–এর কাছে গেলেন। যাওয়ার সময় উম্মে সুলায়ম সঙ্গে কিছু খেজুর দিয়ে দিয়েছিলেন।

নবী (সা.) শিশুটিকে কোলে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ওর সঙ্গে কি কিছু আছে?

তাঁরা বললেন, হ্যাঁ। খেজুর আছে।

রাসুল (সা.) খেজুর চিবিয়ে চিবানো খেজুর শিশুটির মুখে দিলেন। এর পর শিশুটির নাম রাখলেন আবদুল্লাহ। (বুখারি, হাদিস: ৫,৪৭০)(তথ্য https://www.prothomalo.com/religion/islam/sw3br6c0আহ)

পারিবারিক জীবনে ধৈর্যের সুফল

আমরা সকলেই কোন না কোন পরিবারে বাস করি।একটি পরিবার মানে ছোটখাটো একটি সমাজ বা রাষ্ট্র। কয়েকজন মানুষের একান্ত জীবন একসঙ্গে অতিবাহিত হয় বছরের পর বছর। তাই এখানেও পারস্পরিক সম্পর্ক সুদৃঢ় রাখতে প্রয়োজন ছাড় দেওয়ার মানসিকতা, যা ধৈর্যচর্চার মাধ্যমে অর্জিত হয়। দাম্পত্য জীবন নিয়ে একটি বিষয় মনে রাখতে হবে, যেখানে ভালোবাসার সম্পর্ক নড়বড়ে হয় সেখানে ভুল বেশি খোঁজা হয়। ছোট ছোট বিষয়ে বিশাল মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়ে যায়। এজন্য শরিয়ত নির্দেশ দিয়েছে, সবর ও ধৈর্যের। এর ফল মানুষ দুনিয়ায়ও ভোগ করবে, পরকালেও লাভ করবে। সবার কর্তব্য, সাহস ও সহিষ্ণুতা দিয়ে পরিবারকে নিয়ন্ত্রণ করা। এটা কত দোষের কথা, স্বামী তার স্ত্রী সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদে জড়ায়, যে স্ত্রী তার জন্য নিজের জীবনকে বিসর্জন দিতে প্রস্তুত! আর স্ত্রীই বা কীভাবে স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করে অথচ স্বামীর কারণে তার বিশেষ মর্যাদা অর্জিত হয়। পরস্পরকে সহিষ্ণুতা দিয়ে বরণ করতে পারা থেকেই এ ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়।ভুল বা দোষ সব মানুষেরই থাকে। তাই প্রথমে ভুল বা দোষ চিহ্নিত করে ধৈর্যের সঙ্গে অন্যকে বোঝানো যায়। কিন্তু স্বামী যদি ওঁৎ পেতে থাকে স্ত্রীর ভুলভ্রান্তি কীভাবে ধরা যায় আর স্ত্রী লেগে থাকে, স্বামীকে কীভাবে ঘায়েল করা যায়, তা হলে খুশি হয় শয়তান। কারণ হাদিসে এসেছে, শয়তান খুশি হয় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করতে পারলে। অনেক সময় এই ঝগড়া তৃতীয় কোনো কারণে হয়ে থাকে। অনেক সময় হয়তো স্বামী-স্ত্রী নিজেদের কারণে ঝগড়ায় জড়ায় না, তৃতীয় কারও উসকানিতে ঝগড়ায় জড়িয়ে পড়ে। এটাও ঘটে ধীরে-সুস্থে ঠান্ডা মাথায় ধৈর্যের সঙ্গে সমস্যার মূল চিহ্নিত করতে না পারায়। পরিবারে স্ত্রীর কর্তব্য, স্বামীর পরিবারের সবাইকে খুশি রাখা আর স্বামীর কর্তব্য স্ত্রীর বাড়ির সবাইকে খুশি রাখা। যেখানে স্বামী-স্ত্রী দুজনেই এমন ত্যাগের মানসিকতা রাখে, সেখানে সচরাচর বিবাদ বা অসন্তোষ দেখা দেয় না। কখনও একজন রাগ হলে অন্যজনের উচিত হলো ধর্য ও সহিষ্ণুতার সঙ্গে তা সামাল দেওয়া, একই সঙ্গে দুজন রাগ করলে পরিস্থিতি বেসামাল হয়ে পড়ে।

যে পরিবারে ধৈর্যের চর্চা থাকবে, সে পরিবারে শান্তি ও সুখের দেখা মিলবে। কারণ ধৈর্যধারণকারীদের সঙ্গে আল্লাহ থাকেন। পবিত্র কোরাআনে এসেছে, ‘হে মুমিনগণ, তোমরা ধৈর্য ও নামাজের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন।’ (সুরা বাকারা : ১৫৩)। ধৈর্যশীলদের জন্য রয়েছে সফলতার সুসংবাদ। এ বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন, ‘আমি তোমাদেরকে কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং ধন-সম্পদ, জীবন ও ফল-ফসলের ক্ষয়ক্ষতি দ্বারা অবশ্যই পরীক্ষা করব। তুমি শুভ সংবাদ দাও ধৈর্যশীলদের, যারা তাদের ওপর বিপদ আপতিত হলে বলে, (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন) ‘আমরা তো আল্লাহর এবং নিশ্চিতভাবে তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী।’ (সুরা বাকারা : ১৫৫-১৫৭)। একটি সুখময় দাম্পত্য

জীবন গড়ে তুলতে স্বামী-স্ত্রী দুজনেরই স্বপ্রণোদিত ভূমিকা রাখতে হবে।আমাদের পারিবারিক জীবনকে সুখী করতে ও একটি আদর্শ পরিবার গঠন করতে পরিবারের সকলকে অবশ্যই ধৈর্যশীল হতে হবে।

(তথ্য:https://www.shomoyeralo.com/details.php?id=171375#google_)

আল কোরআনের দৃষ্টিতে বালা মসিবতে ধৈর্যের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

আল্লাহ তাআলা মানুষ সৃষ্টি করেছেন। তাঁর সৃষ্টির লক্ষ্য তিনি কুরআন মাজীদে নানা শব্দ-বাক্যে ব্যক্ত করেছেন। কুরআন মাজীদের এক জায়গায় বিষয়টি এই শব্দ-বাক্যে ব্যক্ত করেন

الَّذِيْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ.

তিনিই সেই সত্তা, যিনি জীবন-মৃত্যুকে এ পরীক্ষা করার জন্য সৃষ্টি করেছেন যে, তোমাদের মধ্যে কে অধিক উত্তম আমল করে। আর তিনিই পরাক্রমশালী ও অধিক ক্ষমাশীল। সূরা মুলক (৬৭) : ২

আল্লাহ তাআলা মানুষের এ পরীক্ষা নেওয়ার জন্য সৃষ্টি করেছেন পৃথিবী। মানুষ পৃথিবীতে এসে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নানা রকম পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে থাকে। মানুষের প্রবৃত্তি তার জন্য এক পরীক্ষার বস্তু। এই প্রবৃত্তি-পূজা থেকে বেরিয়ে নিজেকে সঠিক পথের দিশারী বানানোÑ আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশাল এক পরীক্ষা। অনুরূপ মানুষ ও জিনদের মধ্যে যারা সদা অন্যায়ের পথে ডাকছেÑ তারা সঠিক পথের অনুসন্ধিৎসুদের জন্য বড় পরীক্ষা। তাদের ডাকে সাড়া না দিয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া দেওয়াÑ মুমিনের জন্য এক অগ্নিপরীক্ষা। তাছাড়া পার্থিব বিপদাপদ ও কষ্টক্লেশের মাধ্যমেও আল্লাহ তাআলা পরীক্ষা করে থাকেন। একজন মুমিনকে তার জীবনে এসব পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে। এর দ্বারা আল্লাহ তাআলা পরীক্ষা করতে চানÑ কে সবচে উত্তম আমলকারী আর কে নয়। এ পৃথিবীতে শুধু সাধারণ মানুষ নয়, বরং আল্লাহ তাআলার সবচে প্রিয় বান্দাগণও এ পৃথিবীতে কঠিন কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি হয়েছেন। তবে তারা ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে আল্লাহ তাআলার মনোনীত ও সবচে প্রিয় বান্দারূপে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন। অনুরূপ যুগে যুগে নবী-রাসূলগণ ছাড়াও আল্লাহ তাআলার বিশেষ বান্দাগণও বিপদের মুখে পড়ে ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন। তাঁরা আল্লাহ তাআলার মনোনীত ও বিশেষ বান্দা হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। উক্ত সফলতা ও সৌভাগ্য অর্জনের ক্ষেত্রে ধৈর্যের রয়েছে অসাধারণ প্রভাব। এজন্য কুরআন মাজীদ মানুষকে সবর অবলম্বন করার প্রতি উৎসাহ দিয়েছে। নানাভাবে

মানুষকে ধৈর্যের চর্চা করার আহ্বান জানিয়েছে। এবং এর বহুবিধ উপকারিতা ও ফায়দার কথা তুলে ধরেছে।

কুরআন মাজীদে সবর শব্দটি বিভিন্নরূপে প্রায় নব্বই জায়গায় ব্যবহৃত হয়েছে। যেমনটা ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রাহ. (মৃত্যু : ২৪১ হি.) থেকে বর্ণিত রয়েছে। তার মধ্যে বাষট্টি জায়গায় সবরের আদেশসূচক ব্যবহার এসেছে। [দ্র. উদ্দাতুস্ সাবিরীন, ইবনুল কায়্যিম রাহ., পৃ. ৭১, যদিও ইবনে আশুর রাহ. (মৃত্যু : ১৩৯৩ হি.) তাঁর বিখ্যাত কিতাব 'আততাহরীর ওয়াততানবীর' কিতাবে বলেছেন, কুরআন মাজীদে সবর শব্দটি সত্তর বারেরও বেশি ব্যবহৃত হয়েছে। Ñআততাহরীর ওয়াততানবীর ১/৪৭৮]
যাহোক সবর শব্দটি যে কুরআন মাজীদে অনেক জায়গায় উল্লেখিত হয়েছে, সেটা উপরের কথা থেকে স্পষ্ট। এ থেকে বোঝা যায় সবর মুমিনের জীবনে এক অনিবার্য বাস্তবতা। অবশ্য-অর্জনীয় এক বিষয়।

সবর শব্দের অর্থ ও বিশ্লেষণ

কুরআন মাজীদে صبر শব্দটি বিভিন্নরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। এর মূল অর্থ হল, নিজেকে সংকট, অপছন্দনীয় অবস্থা ও পরিস্থিতিতে সুনিয়ন্ত্রিত রাখা, হক ও নীতির ওপর অটল অবিচল রাখা। যদিও সবজায়গায় আভিধানিক অর্থের প্রভাব রয়েছে। কিন্তু শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে এর বিভিন্ন অর্থ রয়েছে। আল্লামা রাগেব আস্ফাহানী রাহ. (মৃত্যু : ৫০২ হি.) তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'আলমুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন'-এ صبر -এর অর্থ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেনÑ

والصبر حبس النفس على ما يقتضيه العقل والشرع، أو عما يقتضيان حبسها عنه.

বিবেক-বুদ্ধি ও শরীয়ত যা করতে দাবি জানায়, নিজেকে তাতে নিয়োজিত করা আর যা থেকে দূরে থাকার দাবি জানায়, তা থেকে নিজেকে দূরে রাখা। Ñআলমুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন, পৃ. ২৭৩

নিচে صبر শব্দটির শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে মৌলিক কিছু ব্যবহার তুলে ধরা হলÑ

এক. বিপদাপদে নিজেকে স্থির রাখা ও আল্লাহ তাআলার ফায়সালার প্রতি সন্তুষ্ট থাকা। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেনÑ

وَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَ الْجُوْعِ وَ نَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَ الْاَنْفُسِ وَ الثَّمَرٰتِ وَ بَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ،الَّذِيْنَ اِذَاۤ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ قَالُوْۤا اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّاۤ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ.

আর আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করবÑ (কখনো) কিছুটা ভয়-ভীতি দ্বারা, (কখনো) ক্ষুধা দ্বারা এবং (কখনো) জান-মাল ও ফল-ফসলের ক্ষয়ক্ষতি দ্বারা। সুসংবাদ শোনাও তাদেরকে, যারা (এরূপ অবস্থায়) সবরের পরিচয় দেয়। যারা তাদের কোনো মুসিবত দেখা দিলে বলে ওঠে, আমরা সকলে আল্লাহরই এবং আমাদেরকে তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে। Ñসূরা বাকারা (২) : ১৫৫-১৫৬

দুই. প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে গিয়ে গোনাহ ও অন্যায় থেকে নিজেকে দূরে রাখা এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান, তাঁর ইবাদাত-বন্দেগী ও দ্বীনের যাবতীয় বিধি-বিধান পালনে সদা তৎপর থাকা। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেনÑ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَ صَابِرُوْا وَ رَابِطُوْا وَ اتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.

হে মু্মিনগণ! সবর অবলম্বন কর, মোকাবেলার সময় অবিচলতা প্রদর্শন কর এবং সীমান্ত রক্ষায় স্থিত থাক। আর আল্লাহকে ভয় করে চল, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। Ñসূরা আলে ইমরান (৩) : ২০০

এখানে সবর শব্দটি অনেক ব্যাপক। এর অনেক শাখা-প্রশাখা রয়েছে। যথা আল্লাহ তাআলার আনুগত্যে অবিচলতা প্রদর্শন করা, গোনাহ থেকে বেঁচে থাকার জন্য মনের ইচ্ছা ও চাহিদাকে দমন করা এবং কষ্ট-ক্লেশ সহ্য করা। এখানে এই তিন প্রকার সবরই উদ্দেশ্য হতে পারে। (তাওযীহুল কুরআন, পৃ. ১৮৫)

তিন. জিহাদের ময়দানে শত্রুর মোকাবেলায় দৃঢ়পদ থাকা। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন

وَ لَمَّا بَرَزُوْا لِجَالُوْتَ وَ جُنُوْدِهٖ قَالُوْا رَبَّنَاۤ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّ ثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَ انْصُرْنَا عَلَي الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ.

তারা যখন জালূত ও তার সৈন্যদের মুখোমুখি হল তখন তারা বলল, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে সবর দান কর এবং আমাদেরকে অবিচল-পদ রাখ। এবং কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য ও বিজয় দান কর। সূরা বাকারা (২) : ২৫০

চার. যালেম ও অত্যাচারীদের যুলুম নির্যাতন সহ্য করা।

وَ لَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوْا عَلٰي مَا كُذِّبُوْا وَ اُوْذُوْا حَتّٰۤي اَتٰىهُمْ نَصْرُنَا وَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِ اللهِ وَ لَقَدْ جَآءَكَ مِنْ نَّبَاِي الْمُرْسَلِيْنَ.

বস্তুত তোমাদের পূর্বে বহু রাসূলকে মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিল। কিন্তু তাদেরকে যে মিথ্যাবাদী বলা হয়েছে এবং কষ্ট দেওয়া হয়েছে তাতে তারা ধৈর্য ধারণ করেছিল; যে পর্যন্ত না তাদের কাছে আমার সাহায্য পৌঁছেছে। এমন কেউ নেই, যে আল্লাহর কথা পরিবর্তন করতে পারে। (পূর্ববর্তী) রাসূলগণের কিছু ঘটনা তোমার কাছে তো পৌঁছেছেই। সূরা আনআম (৭) : ৩৪

এখানে শারীরিক ও মানসিক দুই ধরনের কষ্টই উদ্দেশ্য হতে পারে।

আলকুরআনে ধৈর্যের আদেশের তাৎপর্য

এ পৃথিবী যেহেতু পরীক্ষাক্ষেত্র। তাই নানাভাবে মানুষের জীবনে বিভিন্নমুখী পরীক্ষা আসবে। নানারকম বিপদাপদ আসবে। তাকে এ পরীক্ষায় ও বিপদাপদে ধৈর্য ধারণ করতে হবে। সেই কঠিন বিপদাপদে তাকে উত্তীর্ণ হতে হবে। তাই আল্লাহ তাআলা মানুষকে কুরআন মাজীদের নানা জায়গায় ধৈর্য ধারণের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি তাঁর প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ বিষয়ে নির্দেশ দিয়ে বলেন

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَ لَا تَسْتَعْجِلْ لَّهُمْ كَاَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوْعَدُوْنَ لَمْ يَلْبَثُوْۤا اِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ بَلٰغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ اِلَّا الْقَوْمُ الْفٰسِقُوْنَ.

(সুতরাং হে রাসূল!) তুমি সবর অবলম্বন কর, যেমন সবর অবলম্বন করেছিল দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ রাসূলগণ এবং তুমি তাদের (অর্থাৎ কাফেরদের) বিষয়ে তাড়াহুড়া করো না। তাদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হচ্ছে, যেদিন তারা তা দেখবে, সেদিন (তাদের মনে হবে) তারা যেন (দুনিয়ায়) দিনের এক মুহূর্তের বেশি অবস্থান করেনি। এটাই সেই বার্তা, যা পৌঁছিয়ে দেওয়া হল। অতঃপর ধ্বংস তো হবে কেবল এমন সব লোক, যারা অবাধ্য। Ñসূরা আহকাফ (৪৬) : ৩৫

তিনি মুমিনদেরকে নির্দেশ দিয়ে বলেনÑ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَ صَابِرُوْا وَ رَابِطُوْا وَ اتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.

হে মুমিনগণ! সবর অবলম্বন কর, মোকাবেলার সময় অবিচলতা প্রদর্শন কর এবং সীমান্ত রক্ষায় স্থিত থাক। আর আল্লাহকে ভয় করে চল, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। সূরা আলে ইমরান (৩) : ২০০

ধৈর্য ধারণকারীদের প্রতি আল্লাহর সাহায্যের ঘোষণা

বিপদাপদে ধৈর্য ধারণকারীদেরকে আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য করার ঘোষণা করা হয়েছে। তিনি ইরশাদ করেনÑ

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلٰوةِ اِنَّ اللهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ.

হে মুমিনগণ! সবর ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবরকারীদের সঙ্গে আছেন। সূরা বাকারা (২) : ১৫৩

ধৈর্য ধারণকারীদেরকে বিপদ থেকে উদ্ধারের ঘোষণা

যারা ধৈর্য ধারণ করে, তাদেরকে আল্লাহ তাআলা বিপদ থেকে উদ্ধার করেন। জটিল থেকে জটিল অবস্থায় সহজ পথ দেখান। এবং জীবনের নানা ধাপে তাদেরকে সফলতা দান করেন। তিনি ইরশাদ করেনÑ

اَلَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ قَالُوْٓا اِنَّا لِلهِ وَ اِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ، اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَ رَحْمَةٌ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ.

যারা তাদের কোনো মুসিবত দেখা দিলে বলে ওঠে, আমরা সকলে আল্লাহরই জন্য এবং আমাদেরকে তাঁরই কাছে ফিরে যেতে হবে। এরাই তারা, যাদের প্রতি তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে বিশেষ করুণা ও দয়া রয়েছে এবং এরাই আছে হেদায়েতের ওপর। সূরা বাকারা (২) : ১৫৬-১৫৭

তিনি আরো বলেন

قَالَ مُوْسٰي لِقَوْمِهِ اسْتَعِيْنُوْا بِاللهِ وَ اصْبِرُوْا اِنَّ الْاَرْضَ لِلهِ يُوْرِثُهَا مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَ الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ..

মূসা নিজ সম্প্রদায়কে বলল, আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও ও ধৈর্য ধারণ কর। বিশ্বাস রাখ, যমীন আল্লাহর; তিনি নিজ বান্দাদের মধ্যে যাকে চান এর উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেন। আর শেষ পরিণাম মুত্তাকীদেরই অনুকূলে থাকে। Ñসূরা আ'রাফ (৭) : ১২৮

ধৈর্য ধারণকারীদেরকে পুরস্কার প্রদানের ঘোষণা

আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদে ধৈর্য ধারণকারীদেরকে বিভিন্ন প্রতিদানের কথা শুনিয়েছেন। তিনি ইরশাদ করেনÑ

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَ مَا عِنْدَ اللهِ بَاقٍ وَ لَنَجْزِيَنَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْٓا اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ.

তোমাদের কাছে যা কিছু আছে তা নিঃশেষ হয়ে যাবে। আর আল্লাহর কাছে যা আছে তা স্থায়ী। যারা সবর করে আমি তাদের উৎকৃষ্ট কাজ অনুযায়ী অবশ্যই তাদেরকে প্রতিদান দেব। সূরা নাহল (১৬) : ৯৬

তিনি আরো বলেনÑ

وَ الَّذِيْنَ صَبَرُوا ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ اَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّ عَلَانِيَةً وَّ يَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ اُولٰٓىِٕكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ، جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا وَ مَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآىِٕهِمْ وَ اَزْوَاجِهِمْ وَ ذُرِّيّٰتِهِمْ وَ الْمَلٰٓىِٕكَةُ يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِّنْ كُلِّ بَابٍ، سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ.

এবং তারা সেইসকল লোক, যারা নিজ প্রতিপালকের সন্তুষ্টিবিধানের উদ্দেশ্যে সবর অবলম্বন করেছে, নামায কায়েম করেছে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে এবং তারা দুর্ব্যবহারকে প্রতিরোধ করে সদ্ব্যবহার দ্বারা। প্রকৃত নিবাসে উৎকৃষ্ট পরিণাম তাদেরই জন্য। (অর্থাৎ) স্থায়ীভাবে অবস্থানের সেই উদ্যানসমূহ, যার ভেতর তারা নিজেরাও প্রবেশ করবে এবং তাদের বাপ-দাদাগণ, স্ত্রীগণ ও সন্তানদের মধ্যে যারা নেককার হবে তারাও। আর (তাদের অভ্যর্থনার জন্য) ফেরেশতাগণ তাদের নিকট প্রত্যেক দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে। (আর বলতে থাকবেÑ) তোমরা (দুনিয়ায়) যে সবর অবলম্বন করেছিলে তার বদৌলতে এখন তোমাদের প্রতি কেবল শান্তিই বর্ষিত হবে এবং (তোমাদের) প্রকৃত নিবাসে এটা কতইনা উৎকৃষ্ট পরিণাম। সূরা রা‘দ (১৩) : ২২-২৫

আরো ইরশাদ হয়েছে

اُولٰٓىِٕكَ يُؤْتَوْنَ اَجْرَهُمْ مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوْا وَ يَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ.

এরূপ ব্যক্তিদেরকে তাদের প্রতিদান দেওয়া হবে দ্বিগুণ। কেননা তারা সবর অবলম্বন করেছে, তারা মন্দকে প্রতিহত করে ভালোর দ্বারা এবং আমি তাদেরকে যা দিয়েছি তা থেকে (আল্লাহর পথে) ব্যয় করে। Ñসূরা কাসাস (২৮) : ৫৪

তিনি আরো বলেন

وَ جَعَلْنَا مِنْهُمْ اَىِٕمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوْا وَ كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يُوْقِنُوْنَ.

আর আমি তাদের মধ্যে কিছু লোককেÑ যখন তারা সবর অবলম্বন করলÑ এমন নেতা বানিয়ে দিলাম, যারা আমার নির্দেশ অনুসারে মানুষকে পথ প্রদর্শন করত এবং তারা আমার আয়াতসমূহে গভীর বিশ্বাস রাখত। সূরা সাজদা (৩২) : ২৪

উপরোক্ত আয়াতসমূহ থেকে একথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ইসলামে সবর ও ধৈর্যের বিষয়টি কত তাৎপর্যপূর্ণ ও কত অর্থবহ। ইহকালের শান্তি ও রহমত থেকে শুরু করে পরকালের শান্তি ও সুখের নিশ্চয়তা দান করে এই সবর ও ধৈর্য।

তাই তো রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবর বা ধৈর্যকে আলো সাব্যস্ত করেছেন। ইরশাদ হয়েছেÑ

الصَّبْرُ ضِيَاءٌ.

সবর ও ধৈর্য হল আলো। Ñমুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২২৯০২

অর্থাৎ সবর ও ধৈর্য জীবনকে আলোকিত করে। জীবনের সকল অঙ্গনকে করে দেয় দ্যুতিময়। তাই জীবনকে রাঙাতে, জীবনের প্রতিটি অঙ্গনে আলোর ছোঁয়া পেতে আমাদেরকে অবশ্যই সবর অবলম্বন করতে হবে।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে যাবতীয় অর্থেই সবরকারী ও ধৈর্যশীল হওয়ার তাওফীক দান করুন আমীন।(তথ্য :https://www.alkawsar.com/bn/article/3470/)

বালা মসিবতে হাদিসের আলোকে ধৈর্যের গুরুত্ব

ধৈর্য মহৎ গুণ। পৃথিবীতে মানবসমাজ স্থিতিশীল রাখতে মানুষকে ধৈর্যশীল হওয়ার বিকল্প নেই। ধৈর্য ধারণকারীর সাফল্য সুনিশ্চিত। আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন। ধৈর্য নিয়ে অনেক হাদিস রয়েছে।ধৈর্যে মেলে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সন্তুষ্টি। তাঁর শাফায়াত। আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'আমার উম্মতের যে ব্যক্তি মদিনার দুঃখ-কষ্ট ও বিপদাপদে ধৈর্য ধারণ করবে, তার জন্য আমি কিয়ামতের দিন শাফায়াতকারী হব অথবা তার পক্ষে সাক্ষী হব।' (মুসলিম, হাদিস: ৩২৩৮)

আরেক হাদিসে আছে, ইবনে মালিক (রা.) বলেন, 'রাসুলুল্লাহ (সা.) একটি কবরের কাছে উপস্থিত এক নারীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, সে তখন কাঁদছিল। তিনি বললেন, আল্লাহকে ভয় করো এবং ধৈর্য ধরো।' (বুখারি১২৫২)

ধৈর্য উত্তম চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। ধৈর্যশীল ব্যক্তি কখনো কাউকে প্রথমে আঘাত করতে পারে না। সাবিত (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি আনাস ইবনে মালেক (রা.)-কে বলতে শুনেছি, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, প্রথম আঘাতেই ধৈর্য ধারণ করা হচ্ছে প্রকৃত ধৈর্য।' (মুসলিম, হাদিস: ২০২৪)

আরেক হাদিসে আছে, আবু সাইদ খুদরি (রা.) বলেন, কিছু সংখ্যক আনসারি সাহাবিকে আল্লাহর রাসুল (সা.) বলেছন, যে চাওয়া থেকে বিরত থাকে, আল্লাহ তাকে বাঁচিয়ে রাখেন। যে পর মুখাপেক্ষী না হয়, আল্লাহ তাকে অভাবমুক্ত রাখেন। যে ধৈর্য ধারণ করে, আল্লাহ তাকে সবর দান করেন। সবরের চেয়ে উত্তম ও ব্যাপক কোনো নেয়ামত কাউকে দেওয়া হয়নি।' (বুখারি, হাদিস: ১৪৬৯)

দুনিয়ার জীবন ক্ষণস্থায়ী, কোনো কিছুই স্থায়ী নয়। তাই বিচ্ছেদ এই দুনিয়ার খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। কারও বিচ্ছেদে ধৈর্য ধরতে হবে। আল্লাহর কাছে এর প্রতিদান চাইতে হবে। আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, আল্লাহ বলেন, আমি যখন আমার মুমিন বান্দার কোনো প্রিয়বস্তু দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নেই আর সে ধৈর্য ধারণ করে, আমার কাছে তার জন্য জান্নাত ছাড়া অন্য কিছু (প্রতিদান) নেই।' (বুখারি, হাদিস: ৬৪২৪)।তাই আমাদের উচিত হাদিসের আলোকে ধৈর্যের অনুশীলন করা। এবং সে অনুযায়ী আমল করা।(তথ্য https://www.khaborerkagoj.com/religion/826705)

সাহাবী ও নবীদের জীবনে ধৈর্যের তাৎপর্য

আল্লাহ তায়ালা নবী রাসুল ও সাহাবিদের বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করেছেন।তাদের জীবনী থেকে আমরা ধৈর্য এর তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে পারি।মহান আল্লাহর নবী হজরত ইব্রাহিম (আ.) এর বংশধর, তৎকালীন রোমের অধিবাসী, আল্লাহ তায়া'লার ওহী প্রাপ্ত নবী ও প্রিয় বান্দা, ধৈর্যের বে-মিসাল প্রতীক হজরত আইয়ুব (আ.) সুদীর্ঘ আঠারো বছর পর্যন্ত সহিষ্ণুতার চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে পরম সাফল্য অর্জন করেছিলেন। তাঁর চরম দুঃখ, কষ্ট এবং ধৈর্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার বর্ণনা পবিত্র কোরআন শরীফে এসেছে। যা গোটা বিশ্ববাসীর জন্য এক অমূল্য শিক্ষা।

জীবনের পড়ন্ত বিকেলে উপনীত হযরত আইয়ূব (আ.) রোগাক্রান্ত হয়ে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন এক কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হন যেখানে তিনি সন্তান-সন্ততি, আত্মীয়-স্বজন, দাস-দাসী, বিশাল সম্পত্তিসহ সবকিছু হারান। এক পর্যায়ে জীবনধারণের জন্য শহরের বাইরে এক ছোট্ট কুটিরে আশ্রয় নেন। এই পরীক্ষাকালে স্ত্রী রাহিমাই ছিলেন তাঁর একমাত্র সঙ্গী। কোরআনের ভাষায়, 'এবং স্মরণ কর, আইয়ুবের কথা, যখন সে তার প্রতিপালককে আহ্বান করে বলেছিল, আমি দুঃখ-কষ্টে পড়েছি। তুমি তো দয়ালুদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু। তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিলাম। তার দুঃখ-কষ্ট দূরীভ,ত করে দিলাম, তাকে তার পরিবার-পরিজন ফিরিয়ে দিলাম এবং তাদের সঙ্গে তাদের মতো আরো দিয়েছিলাম, আমার বিশেষ রহমতরূপে এবং ইবাদতকারীদের জন্যে উপদেশস্বরূপ।' (সূরা আম্বিয়া, আয়াত : ৮৩-৮৪)

সামান্য কষ্ট হলে, বিপদ আসলেই আমরা ধৈর্যহারা হয়ে পড়ি। আশ্রয় নেই মিথ্যার, চতুরতার। আল্লাহর রহমতের ওপর আস্থা হারিয়ে হয়ে যাই নিরাশ। অথচ সুদীর্ঘ আঠারো বছর যাবত বিপদাপদ, দুঃখ, কষ্ট, মুসীবতে আবদ্ধ থেকেও হজরত আইয়ুব (আ.) কখনো ধৈর্যচ্যুত হননি। কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য সিজদায় লুটিয়ে বা-সবর মশগুল থেকেছেন মহান আল্লাহর জিকিরে।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, 'নিঃসন্দেহে আমি তাকে (আইয়ুবকে) ধৈর্যশীল পেয়েছি; কত উত্তম বান্দা ছিল সে; নিশ্চয় সে ছিল প্রত্যাবর্তনশীল।' (সূরা সোয়াদ, আয়াত : ৪৪)। অপরদিকে মহান আল্লাহ তাঁর রহমত থেকে নিরাশ না হওয়ার নির্দেশ দিয়ে বলেন, 'তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ রহমত থেকে কেবল অবিশ্বাসী স¤প্রদায়ই নিরাশ হয়।' (সুরা ইউসুফ, আয়াত: ৮৭)। সুরা যুমারের ৫৩ নং আয়াতে আরো বলেন, 'বলুন, হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজেদের ওপর জুলুম করেছ; তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হইও না। নিশ্চয় আল্লাহ সব গোনাহ মাফ করেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'

আল্লাহর অপর এক প্রিয় বান্দা, নবী হজরত ইউনুস (আ.) কেও সামান্য অধৈর্য হওয়ার কারণে রাতের আঁধারে উত্তাল সমুদ্রবক্ষে হিংস্র মৎস্যের উদরে যেতে হয়েছিল। এ প্রসঙ্গ উল্লেখ করে

মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)-কে উদ্দেশ্য করে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ বলেন, 'অতএব, তুমি ধৈর্য ধারণ করো তোমার প্রতিপালকের নির্দেশের অপেক্ষায়, তুমি মৎস্য-সহচর (ইউনুস (আ.)-এর ন্যায় অধৈর্য হয়ো না, সে বিষাদাচ্ছন্ন অবস্থায় কাতর প্রার্থনা করেছিল আপনি ব্যতীত কোনো মাবুদ নাই, আপনি পবিত্র; নিশ্চয় আমি জালিমদের অন্তর্ভুক্ত। তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিলাম এবং তাকে দুশ্চিন্তা হতে মুক্ত করলাম। এভাবেই আমি সৎকর্মশীলদের মুক্তি দিয়ে থাকি।' (সূরা কলম, আয়াত: ৪৮-৫০)।

ধৈর্য বা সবরের প্রয়োজনীয়তা বুঝার জন্য পবিত্র কোরআনের সূরা কাহাফের (৬৫ - ৮২ নং) আয়াতে বর্ণিত হজরত মূসা (আ.) ও খিজির (আ.)-এর ঐতিহাসিক শিক্ষণীয় কাহিনী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কারণ, ইলম অর্জনসহ যেকোনো কাজে সবর এক আবশ্যকীয় গুণ। কেননা ধৈর্যের পরীক্ষা সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, 'আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব যতক্ষণ না আমি তোমাদের মধ্যে মুজাহিদ ও ধৈর্যশীলদেরকে জেনে নেই এবং আমি তোমাদের অবস্থা পরীক্ষা করি।' (সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত : ৩১)। অন্যত্র বলেন, 'অবশ্যই যে ধৈর্য ধারণ করে এবং ক্ষমা করে, নিশ্চয় তা দৃঢ়-সংকল্পের কাজ।' (সূরা শুরা, আয়াত: ৪৩)।

ওহুদ যুদ্ধ এক অবিস্মরণীয় ইতিহাস। যা হিজরতের পঞ্চম বছরে শাওয়াল মাসের ১৫ তারিখে মদিনা মুনাওয়ারা থেকে তিন মাইল উত্তরে অবস্থিত ওহুদ উপত্যকায় মুসলিম ও কোরাইশদের মাঝে সংগঠিত হয়েছিল। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বে মুসলিম বাহিনীর সেনাপতি মহানবী (সা.) ওহুদ পাহাড়ের পাদদেশে ৫০ জনের একদল তিরন্দাজকে গিরিপথ পাহারায় নিযুক্ত করেন এবং বলেন, 'আমাদের জয়-পরাজয় যা-ই হোক, তোমরা এই স্থান পরিত্যাগ করবে না'। ফলশ্রæতিতে, কোরাইশ অশ্বারোহী বাহিনী দুই-দুবার গিরিপথে প্রবেশের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায়। কিন্তু বে-সবর মুসলিমগণ মুসলিম বাহিনীর সেনাপতি মহানবী (সা.)-এর নির্দেশ ভুলে গিয়ে গনিমত সংগ্রহে প্রবৃত্ত হয়। গিরিরক্ষী তিরন্দাজদের ১২ জন বাদে বাকি ৩৮ জন যুদ্ধ শেষ মনে করে স্থান ত্যাগ করে মশগুল হয় সম্পদ সঞ্চয়ে। ঠিক এই সময়ে সুযোগের সদ্ব্যবহার করে কোরাইশ বাহিনী।

গিরিপথ অতিক্রম করে মুসলমানদের পেছন দিক থেকে আক্রমণ করে ছত্রভঙ্গ করে দেয়। অনাকাঙ্ক্ষিত এই পরিস্থিতিতে হযরত মুসআব ইবনে উমায়ের (রা.) ও নবীজির চাচা হযরত হামজা (রা.) সহ অনেক মুসলমান শহীদ হন। তাই, ওহুদের প্রান্তরে নবীজির নির্দেশ উপেক্ষাকারী অধৈর্যশীলদের ভুলের মাশুল দিতে হয় গোটা মুসলিম বাহিনীকে। শহীদ হয় প্রিয় নবীজীর দাঁত মুবারক।

শুধু নবিদের জীবনেই নয় সাহাবিদের জীবনেও রয়েছে ধৈধৈর্যের এমন অনেক উদাহরণ।

সাহাবায়ে কেরামদের অবস্থা এই ছিল যে, যার গোত্রীয় শক্তি ছিল, সে তার গোত্রের সাহায্য পেত এবং স্বীয় গোত্রের লোকেরা তাকে অন্যান্য কাফেরদের কষ্ট হতে রক্ষা করত। কিন্তু বহু সংখ্যক সাহাবীর এ রকম কোন ব্যবস্থা ছিল না। তারা দ্বীনের পথে কুরাইশদের পক্ষ হতে কঠিক যন্ত্রনা ও পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন। তারা ভোগ করেছেন নানা ধরণের শাস্তি ও জুলুম-

নির্যাতন। তাদের মধ্যে ছিলেন আম্মার বিন ইয়াসির, তাঁর মাতা সুমাইয়া এবং তাঁর পরিবার। তারা আল্লাহর পথে কঠোর শাস্তি ভোগ করেছেন।

যখন মরুর বালু উত্তপ্ত হয়ে উঠত তখন তাদেরকে চিৎ করে শায়িত করে শাস্তি দিত। সে অবস্থায় একদা রসূলুল্লাহ্ (ﷺ) তাঁদের নিকট দিয়ে অতিক্রম করার সময় বলেছিলেন- “হে ইয়াসের পরিবার ধৈর্য ধারণ করো, তোমাদের ঠিকানা হচ্ছে জান্নাত।” অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে ইয়াসের ইন্তেকাল করেন।

দুর্বৃত্ত আবু জাহল সুমাইয়া (রাঃ) এর লজ্জাস্থানে তীর দিয়ে আঘাত হানলে তৎক্ষণাৎ তিনি শাহাদত বরণ করেন। তিনি ছিলেন ইসলামের প্রথম শহীদ। তারা আম্মারের উপরও শাস্তি কঠোর করে, কখনও তাকে তারা উত্তপ্ত রোদ্রে ফেলে শাস্তি দিত, কখনও ভারি প্রস্তর তার উপরে চাপিয়ে রাখতো, আবার কখনও আগুনে দগ্ধকরে শাস্তি দিত এবং বলতোঃ যতক্ষণ তুমি মুহাম্মাদ (ﷺ) কে গালি না দিবে অথবা “লাত” ও “উয্যা” সম্পর্কে ভালো কথা না বলবে ততক্ষণ আমরা তোমাকে ছাড়বোনা। তিনি বাধ্য হয়েই তাদের কথায় সম্মতি দেন এবং পরবর্তীতে ক্রন্দনরত অবস্থায় ও রসূল (ﷺ) এর নিকট ক্ষমা প্রার্থনার জন্য উপস্থিত হন। আল্লাহ্ তা'আলা তার প্রেক্ষিতে এই আয়াতটি নাযিল করেন-

مَنْ كَفَرَ بِاللهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ

“যার উপর জবরদস্তি করা হয় এবং তার অন্তর বিশ্বাসে অটল থাকে সে ব্যতীত যে কেউ বিশ্বাসী হওয়ার পর যদি আল্লাহতে অবিশ্বাসী হয়- তাদের উপর পতিত হবে আল্লাহর গযব”। (সূরা নাহল-২৭:১০৬)

যেসমস্ত সাহাবী কাফেরদের নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন বিলাল (রাঃ) তাদের অন্যতম। তাকে আল্লাহর রাস্তায় কঠিন শাস্তি দেয়া হয়েছে। আল্লাহর জন্য নিজের জানকে বিলিয়ে দিয়েছিলেন এবং স্বজাতির কাছে নিজেকে ছেড়ে রেখেছিলেন। মুশরিকরা তাঁকে দুষ্ট ছেলেদের হাতে তুলে দিয়েছিল। ওরা তাঁকে মক্কার গলিতে টেনে নিয়ে বেড়াত, আর তিনি বলতেন, আহাদ, আহাদ। ওরাকা বিন নাওফাল তাঁর পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় বলতেন- হ্যাঁ, বিলাল। ঠিক বলছ। আহাদ, আহাদ। আল্লাহ্ এক, আল্লাহ্ এক। আল্লাহর শপথ! তোমরা যদি তাঁকে হত্যা করে ফেল আমি তাঁর হত্যায় মমতা প্রকাশ করব।

বিলাল (রাঃ) উমাইয়া বিন খালফের দাস ছিলেন। উমাইয়া তাকে লাঠি দিয়ে আঘাত করত, উত্তপ্ত রৌদ্রে অভূক্ত অবস্থায় ফেলে রাখত। যখন দ্বি-প্রহরের কঠিন রোদে বালু উত্তপ্ত হয়ে উঠতো তখন তাকে মক্কার মরুভূমিতে নিয়ে যেত, অতঃপর চিৎ করে শুইয়ে তার বক্ষদেশে বিশাল একটি পাথর চাপিয়ে দিত। তখন তিনি বলতেন, আহাদ, আহাদ (আল্লাহ্ এক, আল্লাহ্ এক)। একদা আবু বকর (রাঃ) তাঁর নিকট দিয়ে অতিক্রম করলেন, সে সময় তার শাস্তি হচ্ছিল। তিনি তাকে একটি কৃষ্ণ দাসের বিনিময়ে ক্রয় করেন। মতান্তরে তিনি তাকে পাঁচ উকিয়া (দু'শ দিরহাম) রৌপ্যের বিনিময়ে ক্রয় করে আযাদ করে দেয়। (https://www.hadithbd.com/books/link/?id=3904)

কৃতজ্ঞ ধনীর তুলনায় ধৈর্য্যশীল দরিদ্র উত্তম

আল্লাহর প্রিয়পাত্র হওয়ার জন্য ধন-সম্পদের হিসেবে দরিদ্র কিংবা ধনী হওয়া কোনো মাপকাঠি নয়। আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য বিষয় হলো- তাকওয়া।

ইসলাম মনে করে, ভালো নয় দান গ্রহণ করার মতো দরিদ্রতা, তেমনি ভালো নয় আল্লাহবিমুখ ধনাঢ্যতা। কিন্তু যদি কোনো ব্যক্তি ধনী হয় আর সে জাকাত, হজ, সদকা ইত্যাদি যাবতীয় হক আদায় করে, তাহলে তার প্রশংসাও এসেছে পবিত্র হাদিসে।

তেমনিভাবে অল্পে তুষ্ট হওয়া দরিদ্রের বিষয়েও প্রশংসা করা হয়েছে।

এখন প্রশ্ন হতে পারে, এই দুই শেণির মানুষের মধ্যে উত্তম কোন ব্যক্তি? দেখা যাক কোরআন-হাদিসের কিছু বর্ণনা।

১. হজরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহতায়ালা খোদাভীরু ধনাঢ্য বান্দাকে পছন্দ করেন। -সহিহ মুসলিম: ২৯৬৫

২. হজরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করতেন, 'হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে কুফর এবং দরিদ্রতা থেকে আশ্রয় চাচ্ছি।

এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন, উভয়ে সমান? তিনি (নবী করিম সা.) বললেন, হ্যাঁ। ' -মিশকাত

অধিকাংশ ইসলামি স্কলারের অভিমত হলো, হাদিসে বর্ণিত দরিদ্রতা বলতে যে দরিদ্রতা উদ্দেশ্য সেটা হলো- যে দরিদ্রতার কারণে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর অসন্তুষ্ট হয়, ধৈর্য্যহীন হয়ে যায়।

বিষয়টি বুঝার জন্য আরও কিছু হাদিস উল্লেখ করা যেতে পারে।

১. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করতেন, 'হে আল্লাহ! আমাকে মিসকিন অবস্থায় জীবিত রাখুন, আমাকে মিসকিন অবস্থায়ই মৃত্যু দান করুন এবং মিসকিনদের কাফেলায় আমাকে পুনরুত্থিত করুন। হজরত আয়েশা (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কেন? তিনি বললেন, কেননা তারা ধনীদের চল্লিশ বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে। ' –সুনানে তিরমিজি: ২৩৫২

এ হাদিসের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, জান্নাতে সেই ধনীরা যাবেন, যারা সম্পদের যাবতীয় হক আদায় করবেন। এরও আগে দরিদ্ররা যাবেন। এতে কৃতজ্ঞ ধনীর তুলনায় ধৈর্য্যশীল দরিদ্রই উত্তম বুঝা যায়।

২. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দরিদ্র মুহাজিরদের উসিলায় বিজয় কামনা করতেন। অথচ ধনীদের ক্ষেত্রে এমন কোনো বর্ণনা নেই। -মিশকাত: ৫১৭৫

৩. সবচেয়ে বড় কথা হলো, হজরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং দরিদ্র ও মিসকিনের ন্যায় জীবনযাপন করেছেন। যদি কৃতজ্ঞ ধনী উত্তম হতো, তাহলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সেই জিন্দেগি দেওয়া হতো।

দুই দিকের হাদিসসমূহ পর্যালোচনা করে অধিকাংশ মুহাদ্দিস ও উলামায়ে কেরাম বলেছেন, কৃতজ্ঞ ধনীর তুলনায় ধৈর্য্যশীল দরিদ্র উত্তম।

(https://www.banglanews24.com/islam/news/bd/645936.detail)

কাফের ও মুশরিকদের নৃশংসতার উপর ধৈর্যধারণের হুকুম

কোরআনের বিভিন্ন জায়গায় আল্লাহ তায়ালা এসম্পর্কে আয়াত নাযিল করেছেন।

আল্লাহ তায়ালা কুরআন শরীফে ইরশাদ করেন:

لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُواْ أَذًى كَثِيراً وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُورِ

অনুবাদ: অবশ্য ধন-সম্পদে এবং জনসম্পদে তোমাদের পরীক্ষা হবে এবং অবশ্য তোমরা শুনবে পূর্ববর্তী আহলে কিতাবদের কাছে এবং মুশরেকদের কাছে বহু অশোভন উক্তি। আর যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর এবং পরহেযগারী অবলম্বন কর, তবে তা হবে একান্ত সৎসাহসের ব্যাপার।

- সূরা আলে ইমরান, আয়াত - ১৮৫

এখানে স্মরণ রাখতে হবে যে, ধৈর্যের অর্থ এই নয়-কাফের, মুশরিকের দুঃখকষ্ট, দুর্ভোগ, নিপীড়ন ও হিংসা সর্বদা সহ্য করা হবে বরং তাদেরকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দিতে হবে, তাদের কাছে সত্যকে স্পষ্ট করতে হবে তবে যদি তারা অমান্য করে বা আল্লাহ বা আল্লাহর রসূলের সাথে ঔদার্যতা প্রদর্শন করে,মুসলমানদের এলাকায় আক্রমণ করে জান,মাল ও সম্মানের ক্ষতি করে তাহলে উচিত হলো যথাসম্ভব প্রতিহত করা। এমতাস্থায় জিহাদ করার আদেশ রয়েছে।

সৎ কাজ করা ও অসৎ কাজ করার ক্ষেত্রে যেই কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়, সেক্ষেত্রে ধৈর্য ধরার জন্য আল্লাহ কুরআনে উল্লেখ করেন:

يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

অনুবাদ: হে বৎস, নামায কায়েম কর, সৎকাজে আদেশ দাও, মন্দকাজে নিষেধ কর এবং বিপদাপদে সবর কর। নিশ্চয় এটা সাহসিকতার কাজ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসার (আঃ) কে বলেছিলেন যে তিনি সর্বদা ধৈর্য ধরতে হবে এবং একই সাথে তাকে এই মহান নেকী অর্জন করার উপায় শিখিয়েছিলেন।

হাদীস শরীফে এসেছে:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ إِنَّ نَاسًا مِنْ الأَنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَعْطَاهُمْ ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ

ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ حَتَّى نَفِدَ مَا عِنْدَهُ فَقَالَ مَا يَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللهُ وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللهُ وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ

অনুবাদ: আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, কিছু সংখ্যক আনসারী সাহাবী আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট কিছু চাইলে তিনি তাঁদের দিলেন, পুনরায় তাঁরা চাইলে তিনি তাঁদের দিলেন। এমনকি তাঁর নিকট যা ছিল সবই শেষ হয়ে গেল। এরপর তিনি বললেনঃ আমার নিকট যে মাল থাকে তা তোমাদের না দিয়ে আমার নিকট জমা রাখি না। তবে যে চাওয়া হতে বিরত থাকে, আল্লাহ তাকে বাঁচিয়ে রাখেন আর যে পরমুখাপেক্ষী না হয়, আল্লাহ তাকে অভাবমুক্ত রাখেন। যে ব্যক্তি ধৈর্য ধারণ করে, আল্লাহ তাকে সবর দান করেন। সবরের চেয়ে উত্তম ও ব্যাপক কোন নি'আমত কাউকে দেয়া হয়নি।

-বুখারী,হাদীস নং-৬৪৭০, মুসলিম, হাদীস নং-১০৫৩, মুসনাদে আহমাদ হাদীস নং-১১৮৯০।

আল্লাহ তায়ালা তার সাহায্য প্রাপ্তির উপায় হিসাবে ধৈর্যকে ঘোষণা করেছেন:

وَاسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِينَ

অনুবাদ: ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য লাভ কর। সালাতকে অবশ্যই কঠিন মনে হয়, কিন্তু তাদের পক্ষে (কঠিন) নয়, যারা খুশূ'(অর্থাৎ ধ্যান ও বিনয়)-এর সাথে পড়ে।

-সূরা বাকারা, আয়াত-৪৫

তাই আমাদের উচিত সকল বিপদেআপদে ধৈর্য ধারণ করা।

অধৈর্য ও তার প্রকাশভঙ্গী

বস্তুত ধৈর্য হলো আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও কাছে অভিযোগ করা থেকে নিজের জিহ্বাকে সংযত রাখা, অন্তরকে ক্রোধ থেকে মুক্ত রাখা, শোকপ্রকাশের সময় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে মুখ চাপড়ানো, বুক চাপড়ানো ও কাপড় ছেঁড়া থেকে বিরত রাখা। আর এসবের বিপরীত কর্মই হলো অধৈর্য। মানুষ ভেদে বিভিন্নভাবে এই অধৈর্য প্রকাশ পেয়ে থাকে। যেমন—

এক. সৃষ্টির কাছে স্রষ্টার বিরুদ্ধে অভিযোগ।

মানুষ যখন বিপদাপদ ও দুঃখ-দুর্দশায় তারই মতো আরেক মানুষের কাছে মহান আল্লাহর বিরুদ্ধে অভিযোগ করে, তখন সে মূলত সৃষ্টির কাছে স্রষ্টার অভিযোগ করে।

অবশ্য কেউ যদি সংকট মুকাবেলার জন্য অন্যকারও পরামর্শ ও সাহায্য কামনা করে এবং তাকে নিজের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করে, তবে সেটা অধৈর্য বা ধৈর্যের পরিপন্থী বলে পরিগণিত হবে না। যেমন—চিকিৎসককে রোগ সম্পর্কে জানানো, নিপীড়িত ব্যক্তির সাহায্যের আবেদন জানানো, বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির উপযুক্ত কারও সাহায্যগ্রহণ। ইত্যাদি।

অধিকন্তু নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে গেলে তার খোঁজ-খবর নিতেন এবং বলতেন, 'তোমার কেমন লাগছে?'

প্রশ্ন আসতে পারে, অস্ফুট আওয়াজে এপন করা কি ধৈর্য-পরিপন্থী?

বস্তুত মানুষের অস্ফুট রুদনের মধ্যে অভিযোগ ও কৃতজ্ঞতার দ্বৈত সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং যদি নিশ্চিত হওয়া যায় যে, কেউ অভিযোগ প্রকাশের জন্য এভাবে ক্রন্দন করছে, তবে সেটা মাকরুহ ও অনভিপ্রেত। আর যদি বোঝা যায় যে, এই ক্রন্দনের মধ্যে কৃতজ্ঞতা ও কৃতার্থতা আছে, তবে সেটা প্রশংসিত ও অভিপ্রেত; অধিকন্তু প্রকৃত সত্য আল্লাহই ভালো জানেন।

শাকীক বলখী বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্যকারও নিকট বিপদাপদের অভিযোগ করবে সে কখনো তার অন্তরে আল্লাহর আনুগত্যের স্বাদ পাবে না।"

উল্লেখ্য যে, অভিযোগও মূলত দুই প্রকার। (ক) মৌখিক অভিযোগ। (খ) আচরণগত অভিযোগ।

মৌখিক অভিযোগ অপেক্ষা আচরণগত অভিযোগই অধিক ক্ষতিকর। একারণেই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিয়ামতপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের আদেশ করেছেন। আর নিয়মত পেয়েও যে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তাকে ভয়াবহ বিপদের সম্মুখীন বলে উল্লেখ করেছেন। কারণ, সে ভালো আছে, তবুও অভিযোগ করছে। এরাই মূলত মহান রবের কাছে সবচেয়ে নিকৃষ্ট!

দুই. বিপদ ও দুঃখ-দুর্দশায় কাপড় ছেঁড়া, বুক ও কপাল চাপড়ানো, হাত থাপড়ানো, চুল কামানো, ধ্বংসের দুআ করা। ইত্যাদি। এসব কাজ অধৈর্যের বহিঃপ্রকাশ বিধায় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের ব্যাপারে দায়মুক্তি ঘোষণা করেছেন, যারা শোকসন্তপ্ত অবস্থায় বুক ও কপাল চাপড়ায়, মাথা কামায় এবং কাপড় ছিঁড়ে।
মৃদু কান্না বা শালীন দুঃখ প্রকাশ অধৈর্যের পরিচায়ক নয়। ইয়াকুব আলাইহিস সালাম সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন–
"শোকে তার চোখ দুটি সাদা হয়ে গিয়েছিল এবং তিনি ছিলেন সংবরণকারী। " (সূত্র ইউসুফ, আয়াত ১৪)
এই আয়াতের ব্যাখ্যায় কাতাদা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'তিনি দুঃসংবরণ করতেন। তাই কেবল ভালো কথাই বলতেন।'
ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-

“চোখ ও হৃদয়ের নীরব কান্না আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে। এটা আল্লাহর অনুগ্রহ বিশেষ। পক্ষান্তরে হাত ও জিহ্বার শোক শয়তানের পক্ষ থেকে আসে।” (মুসনাদে আহমাদ: ২১২৭)

তিন. নিজের দুঃখ-দুর্দশা সর্বত্র প্রকাশ করা।

বিপদে আক্রান্ত হলে অস্থির হওয়া; অথবা কোনো নিয়ামত পেলে অন্যকে তা থেকে বঞ্চিত রাখাও অধৈর্যের একটি প্রকার। আল্লাহ তাআলা বলেন-

“নিশ্চয় মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে অতিশয় অস্থিরচিত্তরূপে। যখন বিপদ তাকে স্পর্শ করে, সে হয় হা-হুতাশকারী। আর যখন কল্যাণ তাকে স্পর্শ করে, তখন সে হয় অতি কৃপণ।” (সূরা মআরিজ, আয়াত: ১৯-২১)

হাদীসে এসেছে—

“মানুষের সবচেয়ে নিকৃষ্ট দোষ হলো অস্থিরতা সৃষ্টিকারী লোভ, আর শূন্যতা সৃষ্টিকারী ভীরুতা।" (সুনানু আবি দাউদ : ২৫১১)

তাই জীবনে কোন অবস্থাতেই অধৈর্য হওয়া যাবে না।(https://www.salafiforum.com/threads/%E0%A6%85%E0%A6%A7%E0%A7%88%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%93-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B6%E0%A6%AD%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A6%BF.17038/?amp=1)

বালা মসিবতে যেভাবে ধৈর্য ধারণ করব

ধৈর্য সৌভাগ্যের প্রতীক। ধৈর্যহীন ব্যক্তি আলোহীন মশালের মতো। ধৈর্য জন্মগত কিংবা পৈতৃক সূত্রে পাওয়া কোনো কিছু নয়। কেউ যদি নিজেকে ধৈর্যশীল বান্দা হিসেবে গড়ে তুলতে চায়, তাহলে তার জন্য সম্ভব।

যেভাবে ধৈর্যের চর্চা করব

১. আল্লাহর একচ্ছত্র ইচ্ছা : এ কথা বিশ্বাস করা যে সব কিছুর রাজত্ব একমাত্র আল্লাহর। ইরশাদ হয়েছে, 'তিনি যা চান তা-ই করতে পারেন। তাঁর কোনো কাজের ওপর প্রশ্ন করার কারো কোনো অধিকার নেই।' আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তিনি যা করেন সে বিষয়ে তিনি জিজ্ঞাসিত হবেন না; বরং তাদের জিজ্ঞাসা করা হবে।

' (সুরা : আম্বিয়া, আয়াত : ২৩)

২. মানুষের সব কিছু লিপিবদ্ধ : সব বিষয় আল্লাহর কাছে লিপিবদ্ধ আছে। আমার কখন কোন মুসিবত আসবে তা আল্লাহর কাছে লিপিবদ্ধ আছে। অসুস্থতা, দারিদ্র্য, দুঃখ-বেদনা, যাবতীয় কল্যাণ-অকল্যাণ—সব কিছু আল্লাহর কাছে লিপিবদ্ধ আছে, এ ধারণা একজন মুমিনের সর্বদাই পোষণ করা। ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, 'যদি সব উম্মত তোমার কোনো উপকারের উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধ হয়, তাহলে ততটুকু উপকার করতে পারবে, যতটুকু আল্লাহ তাআলা তোমার জন্য লিখে রেখেছেন।

অন্যদিকে যদি সব উম্মত তোমার কোনো ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে একতাবদ্ধ হয়, তাহলে ততটুকু ক্ষতি করতে সক্ষম হবে, যতটুকু আল্লাহ তাআলা তোমার তাকদিরে লিখে রেখেছেন। কলম তুলে নেওয়া হয়েছে এবং লিখিত কাগজও শুকিয়ে গেছে।' (তিরমিজি, হাদিস : ২৫১৬)

৩. পার্থিব জীবন সবার জন্য পরীক্ষা : এ কথা বিশ্বাস করা যে পৃথিবীতে যত মানুষ এসেছে কেউই আপদমুক্ত নয়। ছোট-বড় বিপদ-আপদে সবাই আক্রান্ত হয়েছে। এ দুনিয়া বিপদের জায়গা।

তাই এমন ধারণা পোষণ করা যে আমার কোনো ধরনের বিপদ-আপদ আসবে না, তা চরম ভুল। বরং এর মধ্যে বেঁচে থাকতে হবে। আল্লাহ তাআলা কখনো কখনো পরীক্ষার জন্য বিপদ দিয়ে থাকেন, আবার গুনাহ মাফ করার জন্য বিপদ দিয়ে থাকেন, বান্দাকে আরো আল্লাহর নিকটবর্তী করে তোলার জন্য বিপদ দিয়ে থাকেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'মানুষ কি মনে করেছে যে আমরা ঈমান এনেছি—এ কথা বললে তাদের পরীক্ষা না করে অব্যাহতি দেওয়া হবে?' (সুরা : আনকাবুত, আয়াত : ২-৩)

৪. বিপদ মানুষকে আল্লাহমুখী করে : বান্দা যেন বিপদে পড়ে আল্লাহর কাছে ফিরে আসে, সে জন্য আল্লাহ বান্দাকে ছোট-বড় বিপদ দিয়ে থাকেন—এই বিশ্বাস স্থাপন করা। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'যারা তাদের ওপর বিপদ এলে বলে, আমরা তো আল্লাহরই। আর নিশ্চয়ই আমরা তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী।' (সুরা : বাকারাহ, আয়াত : ১৫৬)

৫. মানুষের জন্য কল্যাণ প্রার্থনা : বান্দার জানা নেই তার জন্য কোনটা কল্যাণকর আর কোনটা অকল্যাণকর। তাই কখনো কখনো বিপদ তার জন্য আশীর্বাদ নিয়ে আসে। আল্লাহ তাআলা কোরআনে স্পষ্ট করে বলেছেন, 'তোমরা যা অপছন্দ করো হতে পারে তা তোমাদের জন্য

কল্যাণকর এবং যা ভালোবাসো, হতে পারে তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন তোমরা জানো না।' (সুরা : বাকারাহ, আয়াত : ২১৬)

৬. বিপদে ধৈর্য ধারণের প্রতিদান : এ কথা চিন্তা করা যে দুনিয়া কারো স্থায়ী জায়গা নয়, বরং এটি একটি স্টেশনের মতো। তাই ছোট ছোট মুসিবতের ওপর যদি ধৈর্য ধারণ করি, তাহলে আল্লাহ তাআলা এর জন্য অনেক বড় বিনিময় দান করবেন। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) বলেছেন, দুনিয়া মুমিনের জন্য কয়েদখানা এবং কাফিরের জন্য জান্নাততুল্য। (মুসলিম, হাদিস : ৭৩০৭)

(https://www.kalerkantho.com/online/Islamic-lifestylie/2024/05/15/1388101)

ধৈর্য ঈমানের অংশ

ধৈর্য মানবজীবন এর সাথে ওওতপ্রতভাবে জড়িত।ধৈর্য ব্যতীত একজন মুসলিম কখনো পরিপূর্ণ মুমিন হতে পারে না।ব্যতীত কোন ব্যক্তি জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ অর্জনে সে ধৈর্যের মুখাপেক্ষী। কেননা আমল অল্প হোক কিংবা বেশি, তা আদায় করতে হলে উপযুক্ত ধৈর্যের প্রয়োজন। তাইতো এর প্রতি উৎসাহ দিয়ে অনেক আয়াত ও হাদীস বর্ণিত হয়েছে ।

ইবনে মাসঊদ রা. বলেন: ধৈর্য ঈমানের অর্ধেক।

বিশিষ্ট আলেমগণের অভিমত, ঈমানের অর্ধেক ধৈর্য ও বাকি অর্ধেক শুকরিয়া বা কৃতজ্ঞতা।

সবর ধৈর্যের শব্দের আভিধানিক অর্থ আটকানো, ফিরানো, বাধা প্রদান

শরিয়তের পরিভাষায় ধৈর্য পাঁচ ভাগে বিভক্ত।

(১) ওয়াজিব ধৈর্য : এটি আবার তিন প্রকার।

(ক) আল্লাহর আনুগত্যে ধৈর্যধারণ। অর্থাৎ আল্লাহর হুকুম বাস্তবায়নে নিজেকে নিবেদিত রাখা। যেমন, মুসলিমদের সাথে জামাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা। যাকাত আদায় ও পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা।

(খ) গুনাহ থেকে ধৈর্যধারণ। অর্থাৎ পাপে জড়িত হওয়া থেকে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা। যেমন হারাম দৃষ্টি থেকে ধৈর্যধারণ, অবৈধ সম্পদ ছেড়ে দেয়া। গীবত ও খারাপ বন্ধু-বান্ধব পরিত্যাগ...ইত্যাদি।

(গ) আল্লাহ পক্ষ থেকে নির্ধারিত বিপদাপদের উপর ধৈর্যধারণ। সর্ব সম্মতি ক্রমে এটি ওয়াজিব। অর্থাৎ হতাশা ও নৈরাশ্য প্রকাশ করা থেকে নিজেকে সংরক্ষণ করা। কোন-রূপ অভিযোগ পেশ করা থেকে জিহ্বাকে এবং আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ হয় এমন কাজ থেকে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হেফাজত করা। যেমন গাল চাপটানো, জামা কাপড় ছিঁড়ে ফেলা প্রভৃতি। আত্মীয় স্বজন কিংবা সম্পদ হারানো এবং অসুস্থতার উপর ধৈর্যধারণ এ প্রকারের অন্তর্ভূক্ত, মানুষের কষ্ট দেয়াও এর আওতাভুক্ত।

ধৈর্যের বিপরীত হলো রাগ প্রকাশ করা, অভিযোগ করা, আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ে যাওয়া এবং উৎকণ্ঠা ও নৈরাশ্য ব্যক্ত করা। এর কারণে প্রতিদান নষ্ট হয়ে যায় , বিপদ মুসীবত আরো বেড়ে যায় এবং ঈমান হ্রাস পায়। নেক কাজ করা ও অন্যায় অসৎ কাজ থেকে ফিরে থাকা সম্পর্কিত ধৈর্য বিপদ-আপদের উপর ধৈর্য থেকে উত্তম। এ অভিমত প্রকাশ করেছেন সাইদ ইবনে জোবায়ের, মাইমূন ইবনে মেহরান প্রমুখ। ভাল কাজে ধৈর্যধারণ হারাম থেকে বেঁচে থাকার ধৈর্য থেকে উত্তম।

(২) মোস্তাহাব ধৈর্য : এটি হচ্ছে মাকরূহ কাজ ছেড়ে দেয়া ও মোস্তাহাব আমলের ধৈর্য। যেমন, অপরাধীর মোকাবেলায় তার অনুরূপ অপরাধ না করা।

(৩) হারাম ধৈর্য : যেমন মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত খানা-পিনা পরিত্যাগ করা, ধ্বংসাত্মক বস্তুর উপর ধৈর্যধারণ করা। যেমন, আগুন অথবা পরিবারের কেউ অশ্লীল কাজ করতে চাইলে সে ক্ষেত্রে ধৈর্যধারণ করা।

(৪) মাকরূহ ধৈর্যধারণ: মাকরূহ কাজে অথবা মোস্তাহাব ছেড়ে দেয়ার উপর ধৈর্যধারণ।

(৫) মুবাহ (জায়েজ) ধৈর্য : ক্ষতি হয় না এ পরিমাণ সময় খাবার গ্রহণ না করা অথবা কিছু সময় ঠান্ডার উপর ধৈর্যধারণ।

ধৈর্যের ফযীলত :

ধৈর্য ধারণের ফযীলত অনেক। নিম্নে কয়েকটি উল্লেখ করা হল :

(১) ধৈর্যের প্রতিদান অসীম। আল্লাহ তা'আলা বলেন; একমাত্র ধৈর্যশীলদের প্রতিদান হিসাব ছাড়া দেয়া হবে। (সূরা যুমার: ১০)

যেহেতু সিয়াম ধৈর্যের অন্তর্ভূক্ত, তাই এর প্রতিদানও বিনা হিসেবে দেয়া হবে।

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, বনী আদমের প্রতিটি আমলের প্রতিদান দশগুণ থেকে সাত শত গুন দেয়া হবে। আল্লাহ বলেন: সিয়াম ব্যতীত। কেননা সেটি আমার জন্যে, আর এর প্রতিদান আমিই দেব।

(২) ধৈর্যশীলদের জন্যে মহা সুসংবাদ : আল্লাহ বলেন; 'আপনি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দিন,

যারা মুসীবতে আক্রান্ত হয়ে বলে 'ইন্না-লিল্লাহি ওয়া ইন্না- ইলাইহি রাজিঊন। অর্থাৎ আমরা আল্লাহর জন্যেই এবং পরিশেষে তার কাছেই ফিরে যাব। প্রভুর পক্ষ থেকে তাদের উপর শান্তি ও রহমত রয়েছে এবং তারাই হেদায়েত প্রাপ্ত। (সূরা বাকার: ১৫৫-৫৭)

(৩) আল্লাহর বিশেষ সঙ্গ ও ভালোবাসা : আল্লাহ বলেন;

তোমরা ধৈর্য ধর, নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন। (সূরা আনফাল: ৪৬)

মহান আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

আল্লাহ তা'আলা ধৈর্যশীলদের পছন্দ করেন। (সূরা আলে ইমরান: ১৪৬)

(৪) ধৈর্য উত্তম সম্পদ। আল্লাহ বলেন;

আর যদি তোমরা ধৈর্যধারণ কর তাহলে তা ধৈর্যশীলদের জন্য উত্তম। (সূরা নাহল: ১২৬)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন;

কোন বান্দাকে ধৈর্যের মত উত্তম সম্পদ অন্য কিছু দেয়া হয়নি। (বুখারী)

(৫) আল্লাহ তা'আলা ধৈর্যশীলদের উত্তম প্রতিদানের ওয়াদা করেছেন। তিনি বলেন

অবশ্যই ধৈর্যশীলদের আমলের চেয়েও উত্তম প্রতিদান দেয়া হবে। (সূরা নাহল: ৯৬)

সিয়াম সাধনায় ধৈর্যের অনুশীলন :

ধৈর্যের প্রকারসমূহের মাঝে সিয়াম সাধনা অন্যতম। কেননা এর মাঝে তিন প্রকার ধৈর্যই বিদ্যমান। এটি আল্লাহর আনুগত্যের উপর ধৈর্য ধারণের প্রকৃত স্বরূপ। আবার বান্দা নফ্সের চাহিদার বিপরীত অবস্থান নেয় ফলে এটি গুনাহ থেকে বিরত থাকার ক্ষেত্রে সবরের স্বরূপ। পাশাপাশি নির্ধারিত কষ্ট-মুসীবতের উপর ধৈর্যধারণও এর মাঝে পাওয়া যায়। কেননা রোযাদারকে ক্ষুধা ও তৃষ্ণার কষ্ট সহ্য করতে হয়। এ কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিয়ামের মাসকে সবরের মাস হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন। আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন

সবর মাস তথা রমযান মাসের রোযা এবং প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখা পূর্ণ এক বছর রোযার সমতুল্য। (আবু দাউদ)

ধৈর্য অর্জনে সাধনার প্রয়োজন :

ধৈর্যের জন্যে সাধনা ও অনুশীলনের প্রয়োজন। ভাল কাজ করা, খারাপ কাজ ছেড়ে দেয়া, দুঃখ-বেদনা ও মুসীবতের সময় এবং মানুষ কষ্টে আক্রান্ত হলে, সর্বক্ষেত্রে এটি প্রয়োজন। অবশ্যই এ সমস্ত কাজে মানুষকে কষ্ট করতে হয়। কিন্তু ধৈর্যের পথ অবলম্বন করার স্বরূপ আল্লাহ তা'আলা তাকে সাহায্য করেন। অতঃপর দুনিয়া ও আখেরাতে উত্তম পরিণতি লাভ করে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন;

যে ব্যক্তি ধৈর্যের অনুশীলন করে, আল্লাহ তাকে ধৈর্যধারণের তৌফিক দিয়ে দেন। (বুখারী)

ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভূক্ত হওয়ার জন্যে আল্লাহ তাআলার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা প্রয়োজন। কেননা তিনি ধৈর্যদানকারী ও সাহায্যকারী। আল্লাহ বলেন;

তুমি ধৈর্যধারণ কর। আল্লাহর ইচ্ছাই তোমার ধৈর্যধারণের শক্তি। (সূরা নাহল: ১২৭)

আল্লাহ তা'আলা আপন জাতির প্রতি মুসা আ.-এর বক্তব্য নকল করে বলেন;

‘তোমরা আল্ল¬াহর সাহায্য কামনা কর এবং ধৈর্য ধারণ কর। (সূরা আ’রাফ: ১২৮)

ভাল মানুষের ধৈর্য ও মন্দ লোকের ধৈর্যের মাঝে পার্থক্য :

ভাল মানুষ আল্লাহর আনুগত্যে ধৈর্য ধারণ করে। আর মন্দ মানুষ শয়তানের আনুগত্যে ধৈর্য ধরে। মন্দ লোকেরা কুপ্রবৃত্তির পিছনে অধিক ধৈর্য ধরে। আর আল্লাহর আনুগত্যে খুব কম সময় ধৈর্য ধরে। তারা শয়তানের আনুগত্যে সবকিছু প্রচুর পরিমাণে খরচ করে। কিন্তু আল্ল¬াহর পথে সামান্য বস্তুও খরচ করার উপর ধৈর্যধারণ করে না। নফ্সের চাহিদা পূরণ করতে অনেক কষ্ট সহ্য করে, কিন্তু আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনে কোন কষ্ট করতে চায় না।

নেয়ামতের উপর ধৈর্যধারণ :

অনেকে মনে করে ধৈর্য কষ্টদায়ক বিষয়ের সাথেই সংশি¬ষ্ট। এটি সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। যেভাবে কষ্টের উপর ধৈর্য ধরতে হয়, ঠিক তেমনিভাবে নেয়ামত ও আনন্দদায়ক বিষয়ের উপর ধৈর্য ধারণ করতে হয়। বরং এ ব্যাপারে ধৈর্যধারণ কষ্টের সময়ের ধৈর্যের চেয়ে বেশি কঠিন। আর এ কারণেই সত্যবাদীগণ এ গুণে গুণান্বিত হয় এবং অন্যরা এর থেকে গাফেল থাকে। কারণ নেয়ামতের উপর সবর করার বিষয়টি শক্তি সামর্থ্যরে সাথে সম্পৃক্ত। শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন;মানুষের সুসময়ে ধৈর্যধারণ মুসীবতে ধৈর্যধারণের চেয়ে আরো অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

আল্লাহ তা'আলা বলেন;

আমি মানুষকে অনুগ্রহ করার পর আবার তা ছিনিয়ে নিয়ে গেলে সে নিরাশ ও অকৃতজ্ঞ হয়ে যায়। আর মুসীবতের পর নেয়ামত প্রদান করলে সে বলে, আমা থেকে দূরাবস্থা চলে গেল। সে খুশি হয় এবং গর্ব করে। তবে যারা ধৈর্যধারণ করে এবং নেক আমল করে তাদের জন্যে রয়েছে ক্ষমা ও মহান প্রতিদান। (সূরা হুদ: ৯-১১)

সুদিনে নেয়ামতের উপর ধৈর্যের দিক সমূহ :

(১) নেয়ামতের উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল না হওয়া এবং তা পেয়ে ধোঁকায় না পড়া। গর্ব ও অহংকার না করা। অকৃতজ্ঞ না হওয়া এবং এমনভাবে খুশি না হওয়া, যা দেখে আল্লাহ তাআলা অসন্তুষ্ট হন।

(২) নেয়ামত অর্জনে সম্পূর্ণ ডুবে না পড়া। যার ফলে অন্যান্য দিকসমূহ থেকে গাফেল হয়ে হক ও বাতিলের পার্থক্য না করে তাতে ডুবে থাকা হয়।

(৩) আল্লাহ তা'আলার হক আদায়ে ধৈর্যধারণ।

(৪) হারাম কাজে তা খরচ করা থেকে নিজেকে আঁকড়ে রাখা। নিজের নফসকে এমনভাবে প্রবৃত্তির পিছনে ছেড়ে না দেয়া, যা তাকে হারাম পথে ধাবিত করে।

ধৈর্যের আদব সমূহ :

ধৈর্যধারণের অনেক আদব রয়েছে।

মুসীবত আসার প্রথম ধাপেই ধৈর্যধারণ। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন;

প্রথম আঘাতের ধৈর্যধারণই প্রকৃত ধৈর্যধারণ। (বুখারী)

মুসীবতের সময় "ইন্নালিল্লাহ" পড়া। আল্লাহ তা'আলা বলেন; যখন তাদের উপর মুসীবত আসে তখন তারা বলে, নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর জন্য এবং আমরা তার দিকেই ফিরে যাব। (সূরা বাকারা: ১৫৬)

উম্মে সালামা রা. থেকে বর্ণিত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন; কোন মুসলিম মুসীবতে পড়লে যদি আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না- ইলাইহি রাজিউন, এবং নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করে তাহলে আল্লাহ তাকে উত্তম বস্তু দান করবেন। আল্লাহুম্মা আজিরনী ফী মুসীবাতী ওয়াখলুফ লী খাইরাম মিনহা। উম্মে সালামা বলেন, যখন আবু সালামা ইন্তেকাল করলেন তখন আমি বললাম মুসলিমদের মাঝে আবু সালামার চেয়ে উত্তম আর কে-ই বা আছে ? অল্প সময়ের মাঝেই আল্লাহ তা'আলা আমার জন্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নির্ধারণ করলেন।
এজন্য প্রকৃত মুমিন হওয়ার জন্য অবশ্যই ধৈর্যশীল হতে হবে।(https://m.somewhereinblog.net/mobile/blog/mamunipb/28915667)

ধৈর্য বাড়ানোর উপায়

জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে আমাদের ধৈর্যশীল হতে হবে। এ ধৈর্য ধারণ করা সহজ কোন বিষয় নয়।এর জন্য প্রয়োজন কঠোর সাধনার।ধৈর্য সৌভাগ্যের প্রতীক। ধৈর্যহীন ব্যক্তি আলোহীন মশালের মতো। ধৈর্য জন্মগত কিংবা পৈতৃকসূত্রে পাওয়া কোনো কিছু নয়। কেউ যদি নিজেকে ধৈর্যশীল বান্দা হিসেবে গড়ে তুলতে চায় তাহলে তার জন্য সম্ভব।

কারণ ধৈর্য এমন ফুল, যা সব জায়গায় সুবাস ছড়ায়। আল্লাহ তাআলা কোরআনের বিভিন্ন জায়গায় ধৈর্যশীলদের প্রশংসা করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আর তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করো এবং নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করবে না, করলে তোমরা সাহস হারাবে এবং তোমাদের শক্তি বিলুপ্ত হবে। আর ধৈর্য ধারণ করো।

নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন।' (সুরা আনফাল, আয়াত : ৪৬)

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আর আমরা তোমাদের অবশ্যই পরীক্ষা করব কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং ধন-সম্পদ, জীবন ও ফসলের ক্ষয়ক্ষতি দ্বারা। আর আপনি সুসংবাদ দিন ধৈর্যশীলদের।' (সুরা বাকারা, আয়াত : ১৫৫)

যেভাবে ধৈর্যের চর্চা করব

এক. এ কথা বিশ্বাস করা যে সব কিছুর রাজত্ব একমাত্র আল্লাহর।

ইরশাদ হয়েছে, 'তিনি যা চান তা-ই করতে পারেন। তাঁর কোনো কাজের ওপর প্রশ্ন করার কারো কোনো অধিকার নেই। আল্লাহ তাআলা বলেন, তিনি যা করেন সে বিষয়ে তিনি জিজ্ঞাসিত হবেন না; বরং তাদের জিজ্ঞাসা করা হবে।' (সুরা আম্বিয়া, আয়াত : ২৩)

দুই. সব বিষয় আল্লাহর কাছে লিপিবদ্ধ আছে। আমার কখন কোন মুসিবত আসবে তা আল্লাহর কাছে লিপিবদ্ধ আছে।

অসুস্থতা, দারিদ্র্য, দুঃখ-বেদনা যাবতীয় কল্যাণ-অকল্যাণ সব কিছু আল্লাহর কাছে লিপিবদ্ধ আছে, এ ধারণা একজন মুমিন সর্বদাই পোষণ করে। ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, 'যদি সব উম্মত তোমার কোনো উপকারের উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধ হয়, তাহলে ততটুকু উপকার করতে পারবে, যতটুকু আল্লাহ তাআলা তোমার জন্য লিখে রেখেছেন। অন্যদিকে যদি সব উম্মত তোমার কোনো ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে একতাবদ্ধ হয়, তাহলে ততটুকু ক্ষতি করতে সক্ষম হবে, যতটুকু আল্লাহ তাআলা তোমার তকদিরে লিখে রেখেছেন। কলম তুলে নেওয়া হয়েছে এবং লিখিত কাগজও শুকিয়ে গেছে।' (তিরমিজি, হাদিস : ২৫১৬)

তিন. এ কথা বিশ্বাস করা, পৃথিবীতে যত মানুষ এসেছে কেউ-ই আপদমুক্ত নয়। ছোট-বড় বিপদাপদে সবাই আক্রান্ত হয়েছে। এ দুনিয়া বিপদের জায়গা। তাই এমন ধারণা পোষণ করা যে আমার কোনো ধরনের বিপদাপদ আসবে না, তা চরম ভুল; বরং এর মধ্যে বেঁচে থাকতে হবে। আল্লাহ তাআলা কখনো কখনো পরীক্ষার জন্য বিপদ দিয়ে থাকেন, আবার গুনাহ মাফ করার জন্য বিপদ দিয়ে থাকেন, বান্দাকে আরো আল্লাহর নৈকট্য করে তোলার জন্য বিপদ

দিয়ে থাকেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'মানুষ কি মনে করেছে যে আমরা ঈমান এনেছি—এ কথা বললে তাদের পরীক্ষা না করে অব্যাহতি দেওয়া হবে?' (সুরা আনকাবুত, আয়াত : ২-৩)
চার. বান্দা যেন বিপদে পড়ে আল্লাহর কাছে ফিরে আসে, সে জন্য আল্লাহ বান্দাকে ছোট-বড় বিপদ দিয়ে থাকেন; এই বিশ্বাস স্থাপন করা। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'যারা তাদের ওপর বিপদ এলে বলে, আমরা তো আল্লাহরই। আর নিশ্চয়ই আমরা তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী।' (সুরা বাকারা, আয়াত : ১৫৬)
পাঁচ. বান্দার জানা নেই তার জন্য কোনটা কল্যাণকর আর কোনটা অকল্যাণকর। তাই কখনো কখনো বিপদ তার জন্য আশীর্বাদ নিয়ে আসে। আল্লাহ তাআলা কোরআনে স্পষ্ট করে বলেছেন, 'তোমরা যা অপছন্দ করো হতে পারে তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং যা ভালোবাসো, হতে পারে তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন তোমরা জানো না।' (সুরা বাকারা, আয়াত : ২১৬)
ছয়. এ কথা চিন্তা করা যে দুনিয়া কারো স্থায়ী জায়গা নয়; বরং এটি একটি স্টেশনের মতো। তাই ছোট ছোট মসিবতের ওপর যদি ধৈর্য ধারণ করি, তাহলে আল্লাহ তাআলা এর জন্য অনেক বড় বিনিময় দান করবেন। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) বলেছেন, 'দুনিয়া মুমিনের জন্য কয়েদখানা এবং কাফিরের জন্য জান্নাততুল্য।' (মুসলিম, হাদিস : ৭৩০৭)
সাত. বিপদাপদে এ কথা মনে করা যে আল্লাহ তাআলা যুগে যুগে বিভিন্ন নবী-রাসুল ও তাঁর প্রিয় বান্দাদের নানাভাবে পরীক্ষা করেছেন। আমাকেও পরীক্ষা করে আমাকে নেক বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করবেন। নিশ্চয়ই বিপদের সঙ্গে মুক্তি আছে, কষ্টের সঙ্গে আছে স্বস্তি। এ ছাড়া একজন মুমিনের এ কথা বিশ্বাস রাখা চাই যে আল্লাহ তাআলা বান্দাকে এমন কোনো মসিবত দেন না, যা তার সক্ষমতার বাইরে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আল্লাহ কারো ওপর এমন কোনো দায়িত্ব চাপিয়ে দেন না, যা তার সাধ্যাতীত।' (সুরা বাকারা, আয়াত : ২৮৬)
আট. দুনিয়ার কোনো মানুষ যদি কষ্ট দিয়ে থাকে, তাহলে এর জন্য সুন্দর ব্যাখ্যা বের করার চেষ্টা করা। যেকোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে একটি সুন্দর ব্যাখ্যা দাঁড় করানো। যেমন—কোনো ব্যক্তি আপনাকে রূঢ় ভাষায় আক্রমণ করেছে। আপনি মনে মনে ভাবলেন, লোকটা মনে হয় এমনিতেই রাগী। তাই আমার সঙ্গে এভাবে কথা বলেছে। তার স্বভাব এটা। সুন্দরভাবে কারো সঙ্গে কথা বলতে না পারা, এটা এক ধরনের তার অসুস্থতা।
এ ছাড়া যারা ধৈর্যশীলদের সংশ্রবে যায়, তাদের মধ্যে এই গুণ ধীরে ধীরে চলে আসবে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে ধৈর্যশীল বান্দা হওয়ার তাওফিক দান করুন। আমিন।
(jawadtahir39@gmail.com)

বালা মসিবতে ধৈর্য ধারণের সুফল

ধৈর্য হচ্ছে সফলতার চাবিকাঠি।যে ব্যক্তি যতবেশি ধৈর্যশীল সে জীবনে ততবেশি সফল।অধৈর্য ব্যক্তিরা জীবনে বারবার হেরে যায়।তারা জীবনে কখনও সফলতার মুখ দেখতে পারে না।পৃথিবীতে মানুষের পথচলা ফুলের গালিচার মতো মসৃণ হয় না। নানা সময় নানা বিপদ চলে আসে। তখন ধৈর্য, দৃঢ়তা, অবিচলতা ও দ্বিধাহীন সঙ্কল্পের মাধ্যমে সব বিপদ মোকাবিলা করে এগিয়ে যেতে হয়। বিপদে ধৈর্যহারা না হয়ে মহান আল্লাহর সাহায্য চাওয়া উচিত। পবিত্র কোরআনে এরশাদ হয়েছে- 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা ধৈর্য ও নামাজের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো, আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন।' (সুরা বাকারা : ১৫৩)।

ধৈর্য সফলতার চাবিকাঠি। ধৈর্যহীন ব্যক্তি সব কাজে ব্যর্থ হয়। আনন্দ-প্রফুল্লতার দিনগুলোতে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করতে হয়। আর কষ্ট ও মসিবতের প্রহরগুলোতে ধৈর্যের পরিচয় দিতে হয়। পবিত্র কোরআনে ধৈর্যশীলদের অফুরন্ত প্রতিদান দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'নিশ্চয়ই ধৈর্যশীলদেরকে তো অপরিমিত পুরস্কার পুরোপুরিভাবেই দেওয়া হবে।' (সুরা জুমার : ১০)। আল্লাহর পক্ষ থেকে ধৈর্যশীলদের প্রতি রয়েছে জান্নাতের সুসংবাদ। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'হে রাসুল (সা.) আপনি ধৈর্যশীলদের জান্নাতের সুসংবাদ দিন।' (সুরা বাকারা : ১৫৫)।

মানুষের মধ্যে পাশবিক প্রবৃত্তি সর্বদা অন্যায় ও গর্হিত পাপ কাজ করার জন্য প্রলুব্ধ করতে থাকে। আর পাপ কাজ থেকে নিবৃত্ত হওয়ার জন্য ধৈর্য একটি অপরিহার্য উপাদান। যারা ধৈর্যধারণ করে মানবমনের পাশবিক প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়, তারা জীবনে সফলতা অর্জন করতে পারে। আল্লাহ তায়ালা ঈমানদারদের সর্বাবস্থায় ধৈর্য ধারণের নির্দেশ দিয়েছেন। পবিত্র কোরআনে এরশাদ হয়েছে, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা ধৈর্য ধারণ করো, ধৈর্যে প্রতিযোগিতা করো এবং সর্বদা আল্লাহর পথে প্রস্তুত থাকো, আল্লাহকে ভয় করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।' (সুরা আলে ইমরান : ২০০)।

দুনিয়ায় মানুষের বিপদ-আপদ আসা স্বাভাবিক। কেননা বিপদ-আপদ আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে পরীক্ষাস্বরূপ। কিন্তু পরম করুণাময় এর বিনিময়ে বান্দাদের গুনাহ মাফ করে দেন। হজরত আবু সাঈদ খুদরি (রা.) ও আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করিম (সা.) বলেছেন, 'মুসলিম ব্যক্তির ওপর যে

কষ্ট-ক্লেশ, রোগ-ব্যাধি, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, দুশ্চিন্তা-কষ্ট ও পেরেশানি আসে, এমনকি যে কাঁটা তার দেহে ফোটে, এসবের মাধ্যমে আল্লাহ তার গুনাহগুলো ক্ষমা করে দেন।' (বুখারি : ৫৬৪১)।

মুমিন জীবনে ধৈর্যের পরীক্ষা অনেকভাবে হতে পারে। সাধারণভাবে ধৈর্যের তিনটি ক্ষেত্র রয়েছে। প্রথমত, আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষার ধৈর্য। দ্বিতীয়ত, পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ আপতিত বিপদ-আপদে ধৈর্য। তৃতীয়ত, মানুষের সৃষ্ট বিপদ-আপদে ধৈর্য। সব ধরনের বিপদ-আপদেই মুমিন বান্দার কর্তব্য হচ্ছে ধৈর্যধারণ করে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করা। কোনো ক্ষেত্রে অধৈর্য হয়ে আল্লাহর প্রতি অশোভন বাক্য উচ্চারণ করা জঘন্য পাপ। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'তোমাদের ওপর কোনো বিপদ-মসিবত এসে পড়লে তার ওপর ধৈর্যধারণ করো। বিপদে ধৈর্যধারণ করা নিঃসন্দেহে একটি বড় সাহসিকতাপূর্ণ কাজ।' (সুরা লোকমান : ১৭)।

ধৈর্যশীলতা মুমিন বান্দার একটি কল্যাণকর গুণ, যার অনুশীলন ছাড়া ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনে সাফল্য আশা করা যায় না। যদিও ধৈর্যধারণ করা খুবই কঠিন ও কষ্টসাধ্য কাজ, তথাপি এটা সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কল্যাণের জন্য অপরিহার্য। একবার রাসুলুল্লাহ (সা.) আনসার সাহাবিদের কিছু লোককে বলেন, 'যে ব্যক্তি ধৈর্য ধরে, তিনি (আল্লাহ) তাকে ধৈর্যশীলই রাখেন। আর যে অমুখাপেক্ষী হতে চায়, আল্লাহ তাকে অভাবমুক্ত রাখেন। ধৈর্যের চেয়ে বেশি প্রশস্ত ও কল্যাণকর কিছু কখনও তোমাদের দান করা হবে না।' (বুখারি: ৬৪৭০)।

দুনিয়ায় নবীরা হলেন সবচেয়ে ওপরের স্তরের মানুষ। তাদের ওপরই পরীক্ষা এসেছিল সবচেয়ে বেশি। হজরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে শেষ নবী হজরত মোহাম্মদ (সা.) পর্যন্ত সব নবীকেই এ পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে হয়েছে। আমাদের প্রিয় নবী (সা.) জীবনে অনেক কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে ঈমানের পরীক্ষা দিয়েছেন। ধৈর্য দ্বারা তিনি সব পরীক্ষায় সফল হয়েছেন। তেমনিভাবে দুনিয়ায় যারাই আল্লাহর প্রিয় বান্দা হয়েছেন, তারাই ধৈর্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। অতএব প্রত্যেক মুমিনের উচিত বিপদ-আপদে বিচলিত না হয়ে পড়া, ধৈর্যের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্যের প্রত্যাশা করা।(https://www.shomoyeralo.com/details.php?id=179832)

উপসংহার

আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীতে মানুষকে পাঠিয়েছেন পরিক্ষার জন্য। এজন্য আল্লাহ তায়ালা মানুষকে বিভিন্ন ভাবে পরিক্ষা করে থাকেন, তবে যারা ধৈর্য ধারণ করতে পেরেছে তারাই এই পরিক্ষায় সফলতা লাভ করেছে। যারা অধৈর্য হয়েছে তারা দুনিয়া ও আখিরাতে ক্ষতি গ্রস্থ হয়েছে। মানুষের জীবনে সবর বা ধৈর্যধারণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। দুনিয়া ও পরকালে সবরের নেয়ামতও অনেক বেশি। তাই জীবনে বিপদ-মুসিবত নেমে এলে অস্থিরতা প্রকাশ না করে ধৈর্যধারণ করাই উত্তম। আর তাতে আল্লাহর কাছে পাওয়া যাবে অনেক প্রতিদান।

জগৎ বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম আহমদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, 'আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারিমের নব্বই স্থানে সবর সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।' হাদিসে পাকে সবরকে জ্যোতি বা আলো বলা হয়েছে।

হজরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, 'সবরকে আমরা আমাদের জীবন-জীবিকার সর্বোত্তম মাধ্যম হিসেবে পেয়েছি।' (বুখারি)

হজরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'ঈমানের ক্ষেত্রে সবরের উদাহরণ হল দেহের মধ্যে মাথার মত।' এরপর উঁচু আওয়াজে তিনি বললেন, 'যার ধৈর্য নাই তার ঈমান নেই।'

হজরত আবু সাঈদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'আল্লাহ তাআলা ধৈর্যের চেয়ে উৎকৃষ্ট এবং ব্যাপকতর দান কাউকে দেননি।' (আবু দাউদ)

এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেন-'আল্লাহর নির্দেশ ব্যতিত কোনো বিপদ আসে না আর যে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে তিনি তাঁর অন্তরকে সঠিক পথের সন্ধান দেন।' (সুরা তাগাবুন : আয়াত ১১)

যেসব ক্ষেত্রে সবর করতে হবে তা অনেকেই জানেন না। তিনটি বিষয়ের ওপর সবর করতে হবে। তাহলো-- আল্লাহ তাআলার আদেশের উপর সবর করা।- আল্লাহ তাআলার নিষেধের উপর সবর করা।- বিপদাপদে সবর করা।

আয়াতের মর্মার্থ-- আল্লাহ তাআলা যার অন্তরকে সঠিক পথের সন্ধান দেন; সে হল ওই ব্যক্তি যে বিপদে পড়লে বিশ্বাস করে যে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে। ফলে বিপদে পড়েও সে খুশি থাকে এবং সহজভাবে তাকে গ্রহণ করে।'- 'যে ব্যক্তি বিপদে পড়লে বিশ্বাস রাখে যে, এটা আল্লাহর ফায়সালা মোতাবেক এসেছে। ফলে সে সবর করার পাশাপাশি পরকালে এর প্রতিদান পাওয়ার আশা রাখে এবং আল্লাহর ফয়সালার কাছে আত্মসমর্পণ করে; আল্লাহ তাআলা তার অন্তরকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন। আর দুনিয়ার যে ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে তার বিনিময়ে তিনি তার অন্তরে হেদায়েত এবং সত্যিকার মজবুত বিশ্বাস দান করেন। যা নিয়েছেন তার বিনিময় দান করবেন।'- 'যে ব্যক্তি ঈমান আনে আল্লাহ তার অন্তরকে হেদায়েত দেন।'- এর

অর্থ হলো- সে কোনো ক্ষয়-ক্ষতি ও বিপদের সম্মুখীন হলে বলে ‘ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন’ অর্থাৎ আমরা আল্লাহর জন্যই আর তাঁর কাছেই ফিরে যাব।’

সবরের প্রয়োজনীয়তামানুষের জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ধৈর্যধারণের প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশি। মুমিনের প্রতিটি পদক্ষেপে ধৈর্যের প্রয়োজন। আল্লাহর নির্দেশের সামনে ধৈর্যের প্রয়োজন। আল্লাহর পথে দাওয়াতের ক্ষেত্রে ধৈর্যের প্রয়োজন। কারণ এ পথে নিজেকে পরিচালিত করলে অনেক বেশি কষ্ট-বিপদের মুখোমুখি হতে হয়। আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেন-- ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ‘আপন পালনকর্তার পথের প্রতি আহবান করুন জ্ঞানের কথা বুঝিয়ে ও উপদেশ শুনিয়ে উত্তমরূপে এবং তাদের সঙ্গে বিতর্ক করুন উত্তম পন্থায়। নিশ্চয়ই আপনার পালনকর্তাই ওই ব্যক্তি সম্পর্কে বিশেষভাবে জ্ঞান রাখেন, যে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে এবং তিনিই ভাল জানেন তাদেরকে, যারা সঠিক পথে আছে।’ (সুরা নাহল : ১২৫)- وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرينَ‘আর যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ কর, তবে ঐ পরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ করবে, যে পরিমাণ তোমাদের কষ্ট দেয়া হয়। যদি ধৈর্যধারণ কর, তবে তা সবরকারীদের জন্যে উত্তম।’ (সুরা নাহল : আয়াত ১২৬)- وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلاَّ بِاللّهِ وَلاَ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلاَ تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ‘আর আপনি সবর করবেন। আপনার সবর আল্লাহর জন্য অন্য কারও জন্য নয়; তাদের জন্যে দুঃখ করবেন না এবং তাদের চক্রান্তের কারণে মন ছোট করবেন না।’ (সুরা নাহল : আয়াত ১২৭)দুনিয়াতে দ্বীন কায়েম তথা সত্যের পথে চলতে গেলে চরম ধৈর্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়। বিপদ-আপদের সময় ধৈর্যধারণ সম্পর্কে ছেলেকে উপদেশ দিয়েছেন হজরত লোকমান। কুরআনে এসেছে- يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ‘হে ছেলে! নামাজ প্রতিষ্ঠা করবে, সৎকাজে আদেশ দেবে, মন্দকাজে নিষেধ করবে আর বিপদাপদে সবর করবে। নিশ্চয়ই এটা সাহসিকতার কাজ।’ (সুরা লোকমান : আয়াত ১৭)

সুতরাং নানাবিধ বিপদ-মুসিবত, কষ্ট ও জটিলতার সামনে মুমিনের ধৈর্যের প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশি। তাই দুনিয়াতে যত সংকটই আসুক না কেন; মনে করতে হবে এসব আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে। বিপদকে হালকাভাবে মেনে নেয়া, বিপদে আল্লাহর প্রতি খুশি থাকাও ঈমানের অগ্নি পরীক্ষা।

সবর করার সময় কোনাভাবেই ক্ষোভ, হতাশা ও অস্থিরতা প্রকাশ করা যাবে না। নিজের ভাষা ও আচরণকে সংযত রাখাও জরুরি।

সবরের বৈশিষ্ট্যবিপদ-আপদে ধৈর্যধারণের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো- সবর বা ধৈর্যধারণ বান্দার গোনাহ মাফের অন্যতম উপায়। বান্দা ধৈর্যধারণ করলে আল্লাহ তার গোনাহ ক্ষমা করে দেন। হাদিসে এসেছে-হজরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন- ‘আল্লাহ যখন কোনো বান্দার কল্যাণ চান তখন দুনিয়াতেই তাকে শাস্তি

দেন। কিন্তু বান্দার অকল্যাণ চাইলে তিনি তার গোনাহের শাস্তি থেকে বিরত রেখে কেয়ামতের দিন তার যথার্থ প্রাপ্য দেন।' (তিরমিজি)

এ প্রসঙ্গে বিখ্যাত ইসলামিক স্কলার ইমাম ইবনে তাইমিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, 'বিপদ-মুসিবত হল নেয়ামত। কারণ এতে গোনাহ মাফ হয়। বিপদে ধৈর্যধারণ করলে তার প্রতিদান পাওয়া যায়। বিপদে পড়লে আল্লাহর কাছে আরও বেশি রোনাজারি করতে হয়। তার কাছে আরও বেশি ধরণা দিতে হয়। আল্লাহর কাছে নিজের অভাব ও অসহায়ত্বের কথা তুলে ধরার প্রয়োজন হয়। সৃষ্টি জীব থেকে বিমুখ হয়ে এক আল্লাহর দিকে ফিরে আসতে হয়। যাবতীয় বিপদের মধ্যে এ রকম অনেক বড় বড় কল্যাণ নিহিত রয়েছে।'

মনে রাখা জরুরিধৈর্যের পরিণতি প্রশংসনীয়। বান্দার বিপদ-আপদে যদি গোনাহ ক্ষমা হয়, পাপগুলো ঝরে যায় তবে মুমিন বান্দার জন্য এটা অনেক বড় নেয়ামত। আর বিপদ-মুসিবত যদি কোনো ব্যক্তির মধ্যে ধৈর্য ও আনুগত্য সৃষ্টি করে তবে এই মুসিবত তার জন্য দ্বীনের ক্ষেত্রে বিশাল নেয়ামতে পরিণত হয়।'

এ কারণেই মহান আল্লাহ তাআলা জীবনের সব কষ্ট ও বিপদাপদে নামাজ ও সবরের মাধ্যমে তাঁর কাছে সাহায্য চাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। কারণ, এতেই মানুষের কল্যাণ নিহিত রয়েছে। ধৈর্যের পরিণতি প্রশংসনীয়। আল্লাহ তাআলা মুমিনকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন-يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ'হে মুমিনগন! তোমরা ধৈর্য্য ও নামাজের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা ধৈর্য্যশীলদের সঙ্গে রয়েছেন।' (সুরা বাকারা : আয়াত ১৫৩)

সুতরাং বান্দার বিপদ যত কঠিন ও বড় হবে তার প্রাপ্তিও তত বড় হবে। হাদিসে পাকে প্রিয় নবি এ কথা স্মরণ করিয়ে দিতে ঘোষণা করেন-'বিপদ যত কঠিন হয় পুরস্কারও তত বড় হয়। আল্লাহ কোনো জাতিকে ভালবাসলে তাদেরকে পরীক্ষা করেন। সুতরাং যে তাতে সন্তুষ্ট থাকে আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান আর যে তাতে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে আল্লাহ তার উপর অসন্তুষ্ট হয়ে যান।' (তিরমিজি)

আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ধৈর্যধারণ করার মাধ্যমে দুনিয়া ও পরকালের সব নেয়ামত ও সন্তুষ্টি অর্জনের তাওফিক দান করুন। কুরআন-সুন্নাহর উপর যথাযথ আমল করার তাওফিক দান করুন। আমিন।(https://www.jagonews24.com/religion/news/649287)